পঞ্চম অধ্যায়

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গের মুসলমান সমাজের লৌকিক কথা-সাহিত্য

লোককথার (Folk Tale) ভূমিকা

গল্প শোনা ও বলার নেশা প্রায় সকল দেশে সকল সমাজেই বর্তমান। লোকসমাজের সাধারণ স্তরের জনগণের যে সাধারণ দান - তার উপরই সুসংস্কৃত রুচি-শিক্ষাদীক্ষায় জাত লৌকিক কথা সাহিত্য। লৌকিক কাহিনীর এই বর্ণনামূলক ভঙ্গির মাধ্যম গদ্য ও পদ্য। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে -'পদ্য ও গদ্য উভয়বিধ রচনার ভিতর দিয়াই লৌকিক কাহিনী বর্ণনা করা হইয়া থাকে, পদ্যের ভিতর দিয়া যাহা প্রকাশ করা হয়, তাহা গীতিকা ও এপিক নামে পরিচিত, গদ্যের ভিতর দিয়া যে কাহিনী প্রকাশ করা হয়, ইংরেজীতে তাহাকেই সাধারণভাবে Folk Tale বলা হয়' (১)

ভারত তথা বাংলা লোকসাহিত্যে লোককথার গুরুত্ব অসাধারণ। উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে ব্রিটিশ সিভিলিয়ান, খ্রীষ্টান মিশনারীদের আগ্রহাতিশয্য ও চেষ্টায় সংকলিত ও আলোচিত, কারণ এ দিক থেকে লোককথার এ সুমহান ঐতিহ্য ভারতে বর্তমান। (২)

যুক্ত বাংলার অংশ লোককথা আবিষ্কৃত হলেও উত্তরপশ্চিম সীমান্ত বঙ্গের লোককথা আজও অবহেলিত ও অনাবিষ্কৃত - যা হিন্দু ও মুসলিম উভয় সমাজেই প্রচলিত। তারই কতিপয় আমাদের বর্তমান পরিচ্ছেদে হল বিবৃত।

পাদটীকা :

(১) ভট্টাচার্য আশুতোষ - বাংলার লোক সাহিত্য : প্রথম খণ্ড -(তৃয় সং)পৃ - ৪৪০
(২) Cultural Heritage of India Vol -5 Page 684.

।। কবিরাজ ও চাকর ।।

(এ লোককাহিনীটি মালদহ ও পশ্চিম দিনাজপুরের বঙ্গ মুসলমান সমাজে প্রচলিত। এটি মালদহের গাজোল থানার অন্তর্ভুক্ত ময়না হলদীবাড়ী গ্রামের আমিনুল হকের (পিতা তামিজুদ্দিন সরকার) নিকট থেকে সংগৃহীত। একটা চিতায় তিনজন পুড়ে মরার রহস্য চাকরটি তার মনিব কবিরাজের কাছ থেকে গল্পচ্ছলে জেনে নিয়েছে। রাজার ছেলের সঙ্গে মন্ত্রীর ছেলের বন্ধুত্ব থাকলেও উভয়ের বৌ কিন্তু ভিন্ন প্রকৃতির। একজন গোপনপ্রেমিকের কথা মত নিজের স্বামীকে কেটে ফেলেছে অন্যজন একেবারে সতী নারী। সে নিজের স্বামীর বন্ধু মৃত রাজপুত্রকে ষষ্ঠী দেবীর সহায়তায় জীবিত করেছে। কিন্তু পরিশেষে সতী নারীর মৃত্যুতে রাজপুত্র ও মন্ত্রী-পুত্র পৃথিবীতে বেঁচে থাকার সংকল্প চিরদিনের মত ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে।)

আমাদের দেশে কোন এক সময় এক বুড়ো কবিরাজ ছিলেন। তিনি প্রত্যহ জড়ি-বুটির পুঁটলি ও ওষুধের বাক্স নিয়ে দূর-দূরান্তে যেতেন রুগীর চিকিৎসা করতে। ওষুধের বাক্স বহে নিয়ে যাওয়া তাঁর পক্ষে কষ্টকর ছিল। তাই তিনি দশ বছরের একটি ছেলেকে চাকর রাখলেন। ছেলেটি বলল, "আমি বেতন চাই না, তিনবেলা খেতে পেলেই খুশী হব আর রোজ একটা করে নূতন গল্প শুনিয়ে আমার মনে আনন্দ দিতে হবে।" কবিরাজ তাতেই রাজী হলেন। একদিন চিকিৎসার কাজ সেরে বাড়ী ফেরার পথে দুজনকে একটা গাছতলায় রাত কাটাতে হল। তিনি চাকরকে পাঠালেন বাজার করতে। বাজারের পথে এক নদীর ধারে শ্মশান। সেখানে চাকরটি একসঙ্গে তিনজনকে পুড়তে দেখে তাজ্জব হল। সে এর রহস্য কিছুই বুঝতে পারল না। অনেকক্ষন ধরে সে চিন্তা করেও যখন কারন টা খুঁজে পেল না তখন সে নিজের মনিবের কাছে ফিরে এসে রাস্তার ঘটনা সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করল। কবিরাজ দেখলেন বাজার না হলে তাদের অনাহারে থাকতে হবে। তাই তিনি চাকরটিকে খুব বুঝিয়ে বললেন, "আগে বাজার থেকে চাল, ডাল, শাক-সব্জী নিয়ে এস তারপর শ্মশানের ঘটনা সম্পর্কে আলোচনা হবে।" চাকরটি খুব শীঘ্রই বাজার করে ফিরে রান্নার কাজে হাত দিল। কবিরাজ হুঁকো টানতে টানতে এবার খোস মেজাজে নূতন গল্প আরম্ভ করলেন।

রাজার ছেলে ও মন্ত্রীর ছেলে দুজনে একই বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করত। দুজনের মধ্যেই খুব সদ্ভাব ও বন্ধুত্ব। বিদ্যালয়ের অন্যান্য ছেলেরা বছরে একবার

কিংবা দুবার মাস্টার মশাইয়ের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে নিজেদের মামার বাড়ী বেড়াতে যায়। রাজার ছেলে আর মন্ত্রীর ছেলে স্থির করল তারাও শ্বশুর বাড়ী বেড়াতে যাবে। স্কুল থেকে ছুটি নিয়ে দুবন্ধু চলল নিজেদের শ্বশুর বাড়ী। মন্ত্রীর ছেলের শ্বশুর বাড়ী অনেক দূরে। তাই মন্ত্রীর ছেলে প্রথমে গিয়ে উঠল নিজের বন্ধুর শ্বশুর বাড়ীতে। স্বামী এসেছে দেখে রাজকন্যা খাওয়া - দাওয়া সেবা যত্নের কোন ত্রুটি রাখে নি, রাতের বেলায় একঘরে থাকল রাজপুত্র ও রাজকন্যা। মন্ত্রীর ছেলেকে ঘরের বারান্দায় ঘুমাতে দেওয়া হল। সেদিন তিনজন চোর রাজার বাড়ীতে চুরি করতে এসে জানালা দিয়ে রাজকন্যার কীর্তি কলাপ লক্ষ্য করে। আগে থেকে এক ঘোড়া ঘাসীর সঙ্গে রাজকন্যা অবৈধ প্রেমে জড়িত ছিল। রাত বারটার সময় যখন রাজার ছেলে ঘুমিয়ে পড়েছে ঠিক সেই সময় চুপি চুপি রাজকন্যা ঘোড়া ঘাসীর কাছে গিয়ে হাজির হল। দেরী দেখে ঘোড়া ঘাসীর অত্যধিক রাগ হয়েছিল। সে চাবুক নিয়ে পর পর বসিয়ে দিল রাজকন্যার পিঠে। পিঠের চামড়া গেল উঠে। এই ক্ষত একটা স্মৃতি চিহ্ন হিসাবে রয়ে গেল। ঘোড়া ঘাসী তাকে বলল, "তুমি যদি সত্যি সত্যিই আমাকে ভালবাস তাহলে এই নাও খড়্গ আর এই মুহূর্তে রাজার ছেলের মুণ্ড কেটে আমার কাছে নিয়ে এস।" যেই বলা অমনি রাজকন্যা নির্বোধের মতো ঘরে ঢুকে নিজের স্বামীর মুণ্ড কেটে হাজীর করল। মন্ত্রীর ছেলে আর চোরেরা আড়াল থেকে সব কিছু লক্ষ্য করছিল। রাজকন্যার নিষ্ঠুর ও নির্দয় ব্যবহারে ঘোড়াঘাসী অত্যন্ত দুঃখ পেল। সে ঐ মুহূর্তে রাজকন্যাকে তাড়িয়ে চিরদিনের জন্য সম্পর্ক ছিন্ন করল। রাজকন্যা মুণ্ড এনে দেহের সঙ্গে যোগ করে বসে বসে কাঁদতে শুরু করল। তার কান্না শুনে রাজরানী ছুটে এল। মেয়েকে ঘটনা সম্পর্কে খুলে বলতে বললে সে জানালো, "মন্ত্রীর ছেলে ঘরে ঢুকে আমার উপর অত্যাচার করতে উদ্যত হলে স্বামী এর প্রতিবাদ করে। তার পরেই সে খড়্গ নিয়ে মুণ্ডটা কেটে ফেলে।" রাজা মন্ত্রীর ছেলেকে ধরে কয়েদখানায় রেখে সকালে ফাঁসির হুকুম দিলেন।

সকালবেলা প্রকাশ্য জনসভায় মন্ত্রীর ছেলের ফাঁসী হবে শুনে সেখানে ঐ তিনজন চোর হাজির হল। তারা বলল, "মন্ত্রীর ছেলে নির্দোষী আর সম্পূর্ণ দোষ রাজকন্যার।" তারা সম্পূর্ণ ঘটনা খুলে বলল আর প্রমাণ স্বরূপ পিঠে চাবুকের ক্ষত দেখতে অনুরোধ করল। রাজা পিঠের কাপড় তুলে চাবুকের দাগ দেখতে পেয়ে চোরের কথা বিশ্বাস করলেন। মন্ত্রীর ছেলে মুক্তি পেল। রাজকন্যাকে ফাঁসী কাঠে ঝুলে জীবন হারাতে হল। বন্ধুর মৃতদেহ একটা কাঠের বাক্সে ভরে

মাথায় উঠিয়ে এবার মন্ত্রীর ছেলে চলল নিজের শ্বশুর বাড়ী। কয়েকদিন পথ চলার পর সে শ্বশুরের রাজ্যে পৌঁছাল। কিন্তু সমস্যা হল বাক্স নিয়ে। পথের ধারে এক জঙ্গলে বাক্সটা লুকিয়ে রেখে সে শ্বশুর বাড়ী হাজির হল। দীর্ঘ কয়েকবছরের পর জামাই এসেছে দেখে শ্বশুর শাশুড়ীর ভারী আনন্দ। মন্ত্রীর ছেলের বৌ রাজকন্যা ও খুব আদর যত্ন করে স্বামীকে খেতে দিল। রাত্রিবেলা দুজনে সোনার পালঙ্কে ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু মন্ত্রীর ছেলের ঘুম হবে কেন? সে রাজকন্যার সতীত্ব পরীক্ষা করার জন্য ঘুমের ভান করে রইল। স্বামীর নিদ্রিত অবস্থা দেখে রাজকন্যা সোনার থালায় নৈবেদ্য সাজিয়ে হাজির হল গ্রামের বাইরে জঙ্গলে অবস্থিত এক দুর্গা মন্দিরে। স্ত্রীর প্রতি স্বামীর সন্দেহ মন ছুটে চলল পিছনে পিছনে তার গতিপ্রকৃতি লক্ষ্য করার উদ্দেশ্যে। তার সন্দেহ দূর হল। রাজকন্যার কাছে সে তার মৃত বন্ধুকে জীবিত করার বিষয় প্রকাশ করলে পরদিন রাতে পুজো শেষে দেবীর পায়ে পড়ে অনেক কাকুতি মিনতি করল সে। দেবী রাজকন্যার ভক্তি দেখে খুশী হলেন। হঠাৎ জঙ্গল থেকে বের হয়ে এলেন আশি বছরের এক বুড়া। তিনি বললেন, "মরাকে জীবিত করতে দুজন লোকের দরকার হবে। একজন থাকবে মাথার দিকে ও অন্যজন পায়ের দিকে। কিন্তু খবরদার। মৃতের শরীরে যেন হাত না ঠেকে। কারন হাত ঠেকালেই মরতে হবে।"

তার পরদিন মন্ত্রীর ছেলে জঙ্গল থেকে কাঠের বাক্স তুলে আনল। স্বামী-স্ত্রী দুজনে মৃতের মাথা ও পায়ের দিকে দাঁড়াল। রাজার ছেলে জীবিত হল বটে কিন্তু অচমকা রাজকন্যার হাত তার শরীরে ঠেকতেই সে মারা গেল। এখন দু বন্ধু মৃত রাজকন্যাকে নিয়ে গেল শ্মশানে শবদাহ করতে। চিতা সাজিয়ে আগুন ধরানো হল। মন্ত্রীর ছেলে সতী স্ত্রীর মৃত্যুতে ভেঙে পড়ল। ভাবল দুনিয়ায় বেঁচে লাভ নেই। এরূপ সাত-পাঁচ চিন্তা ভাবনা করে সে চিতায় ঝাঁপ দিল। অন্য দিকে তার বন্ধু রাজার ছেলে ও চিন্তা করল, যাদের জন্য আমি জীবন ফিরে পেলাম তারাই যখন নেই তখন আমার বেঁচে থাকা উচিৎ হয় না। এই কথা ভেবে সেও চিতায় পুড়ে মরল।

****

।। এক বিধবা ও তার ছেলে ।।

(এ লোককাহিনীটি পশ্চিম দিনাজপুর জেলার ইটাহার অঞ্চলে প্রচলিত। এটি চন্দনপুর গ্রামের (চুড়ামন, ইটাহার) মোঃ মোস্তাকিমের নিকট থেকে সংগৃহিত। কাহিনীটিতে এক বিধবার দু ছেলে স্থান পেয়েছে। ছোট ভাই অলস প্রকৃতির ।

সে কাণ্ডজ্ঞানহীনের মত কাজ করেও শেষ পর্য্যন্ত রাজার সৈন্যদের পরাজিত করে অর্ধেক রাজত্ব ও রাজকন্যাকে লাভ করতে সক্ষম হয়েছে।)

এক বিধবার দু ছেলে। বড় ছেলে গ্রামের এক গেরস্তের বাড়ীতে চাকুরী খাটে আর ছোট ছেলে নিজের বাড়ীর দু এক বিঘা জমিতে চাষ আবাদ করে। এবার মাঠে ভাল ধান। অগ্রহায়ন মাস। ধান সম্পূর্ণ পেকে গেছে। একদিন বড় ভাই ছোট ভাইকে বলল, "জমির ধান কেটে নিয়ে এস।" সে একটা কাস্তে নিয়ে জমিতে রেখে বাড়ী ফিরে এসে বড় ভাইকে জানাল কাস্তে নিজেই ধান কাটছে দেখে আমি চলে এলাম। বিকেলের দিকে আবার সে ছুটল মাঠে। দেখল কাস্তে খুব গরম। সে ভাবল কিন্তু তার জ্বর হয়েছে। পাশে একটা কুপ ছিল। দড়িতে বেঁধে কাস্তেটাকে কুপের মধ্যে ফেলে উঠিয়ে দেখল ঠান্ডা হয়ে গেছে। ভাবল সত্যি সত্যিই এবার ওর জ্বর ছেড়েছে। এরপর বেশ কিছু দিন পর একদিন দুপুর বেলায় তার মা জ্বরে ছট ফট করছে। বড় ভাই মায়ের এরূপ অবস্থা দেখে ডাক্তারকে ডেকে আনবে ভাবছে। যাওয়ার জন্য তৈরীও হল। এমন সময় ছোট ভাই বলল,"আমি জ্বর ভাল করার ওষুধ জানি।" বড় ভাই তাকে তাড়াতাড়ি চিকিৎসা করতে অনুরোধ করল।

ছোট ভাই তার জানা বিদ্যা খাটবার জন্য সবরকম প্রস্তুতি নিল কারন কাস্তের জ্বর ছাড়িয়ে দিয়ে সে নিজেকে একজন নামকরা ডাক্তার মনে করে কতই না গর্ব অনুভব করছে। সে মায়ের গলায় দড়ি বেঁধে ডুবান কুপের মধ্যে। আধ ঘন্টার পর উঠিয়ে দেখল শরীরে বিন্দুমাত্র তাপ নেই। সে মনে করল জ্বর সম্পূর্ণ ছেড়ে গেছে। বড় ভাই এসে দেখছে মা আর নেই। রাগে সে ছোট ভাইকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিল। ছোট ভাই এখানে ওখানে ঘুরতে ঘুরতে এক রাজার বাড়ীতে ছাগল চরাবার কাজ পেল। মাঠে ছাগল গুলোকে নিয়ে গেল চরাতে। দুপুরের সময় একটা বটগাছ তলায় বসে সে মুড়ি চিবাতে লাগল। ছাগল সব ছায়ায় আরাম করছে আর চিরদিনের অভ্যাস মতো জাবর কাটছে। সে মনে ভাবল তার দেখাদেখি ছাগল গুলোও মুখ নাড়ছে। পশু হয়ে তাকে উপহাস করবে এটা তার কিছুতেই সহ্য হল না। সে রাগে একটা লাঠি দিয়ে পিটিয়ে পিটিয়ে রাজার সব ছাগল মেরে ফেলল। সে সময় কোথা থেকে হঠাৎ তার বড় ভাই সেখানে এসে হাজির। সে দেখল রাজার হাতে পড়লে তার ভাইয়ের নিস্তার নেই। তাছাড়া ভাইয়ের সঙ্গে তার নিজেরও জীবনের আশা থাকবে না। ছোট ভাই একটা

ছাগলের পেট কেটে নাড়ি-ভুঁড়ি সহ বড় ভাইকে নিয়ে পালাতে শুরু করল। সন্ধ্যা হলে দু'ভাই একটা বড় ধরনের আম গাছ দেখে সব চাইতে উপর ডালে উঠে রাত কাটাতে বাধ্য হল। সেইদিন বিয়ে করে বরযাত্রীসহ সাঁওতাল বর-কনে বাড়ীর পথে রওয়ানা হলে ঐ গাছতলায় তাদেরকেও রাত কাটাতে হল। ঠিক রাত দেড়টা কি দু'টোর সময় ছোট ভাই আচমকা ছাগলের নাড়ি ভুঁড়িটা উপর থেকে ফেলল বরযাত্রীদের উপর। বর-কনে সহ বরযাত্রীরা ভয়ে যে দিকে পারল ছুটে পালাল। ছোট ভাইয়ের কীর্তি-কলাপ দেখে বড় ভাইয়ের বুকখান কামারশালার হাঁপরের মতো ওঠানামা করছে। কিছুক্ষন পর দু'ভাই নামল গাছ থেকে। বিয়ের দান গয়নাগাঁটি, কাপড়-চোপড়, থালাবাসন, টাকাপয়সা আর একটা ফাটা ঢোল পড়ে রয়েছে। ছোট ভাই শুধু ফাটা ঢোলটা নিল, বাদবাকি কুড়িয়ে বড়ভাই নিজের কাছে রাখল। এবার দু'ভাই রাস্তা ধরল।

দু'জনে মনের আনন্দে পথ হেঁটে চলেছে। হঠাৎ ছোট ভাই একটা আম গাছে মৌচাক দেখতে পেল। সে বড় ভাইকে বলল, "ফাটা ঢোলের মধ্যে মৌমাছিগুলোকে ঢুকাতে হবে।" বড়ভাই ভাবল ছোটভাই নিজেও মরবে আর আমাকেও মেরে ফেলবে। মৌমাছির ভয়ে বড়ভাই দূরে গিয়ে লুকিয়ে থাকল। ছোট ভাই ফাটা ঢোল মৌচাকের কাছে রেখে যেই বলল, "ঢুকরে মাছি তাক্ তাক্" সঙ্গে সঙ্গে সব মৌমাছি তাতে ঢুকে পড়ল। দু'ভাই আবার পথ চলতে লাগল। ছোট ভাই বড় ভাইকে জানাল এবার রাজার সঙ্গে লড়াই করতে হবে। কিছু দূর গিয়ে দেখল এক পুকুরে ধোপা রাজবাড়ীর কাপড় সাফ করছে। সামনে ছিল ঘোড়া। ছোট ভাই ইচ্ছে করে কাপড়ের উপর দিয়ে ঘোড়া দৌড়িয়ে দিল। রাজার দামী দামী কাপড় ছিঁড়ে গিয়ে নষ্ট হল। ধোপার মুখে রাজা এ খবর পেয়ে ভীষন রেগে গেলেন। সেনাপতিকে সৈন্য নিয়ে পাঠালেন লড়াই করতে। সৈন্যদের দেখতে পেয়ে বড় ভাই তো ভয়ে মাটির এক গর্তে লুকিয়ে রইল। ছোট ভাইকে একাই মোকাবিলা করতে হল। সে ফাটা ঢোল মাটিতে রেখে বলল, "বাহিরা মাছি ছেঁক ছেঁক" অমনি ঝাঁকে ঝাঁকে মৌমাছি বের হয়ে সৈন্যদের নাকে মুখে হুল ফুটিয়ে একেবারে অস্থির করে তুলল। রাজা হাত জোর করে তাকে বলল, "আমাদের রক্ষা করো, আমি তোমাকে অর্ধেক রাজত্ব দান করব আর রাজকন্যার সঙ্গে তোমার বিবাহ দিব।" ঢুকরে মাছি তাক্ তাক্ বলতেই মৌমাছিরা আবার ঢুকে পড়ল। রাজা আর সৈন্যরা রক্ষা পেলেন। ছোট ভাই রাজকন্যাকে বিয়ে করে অর্ধেক রাজত্ব নিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে দিন কাটাতে লাগল।

****

।। দু ভাই ও গৃহলক্ষ্মী ।।

(এ লোক কাহিনীটি মালদহের দ্বারবঙ্গীয় মুসলমান সমাজে এমনকি খোট্টা ভাষাভাষী হিন্দু সমাজেও প্রচলিত। অবস্থা সম্পন্ন ও শিক্ষিত বড় ভাইয়ের কাছে নির্যাতিত ও অপমানিত ছোট ভাই ভাগ্য দেবতা কিংবা ভাগ্য দেবীর কৃপালাভ করেছে। দু ভাইয়ের অবস্থা পরিবর্তনের মূল কারন যে ভাগ্য দেবী সেটা ছোট ভাইয়ের মনে বদ্ধমূল হয়েছে। হিন্দু-মুসলমান উভয়ের ধর্মীয় বিশ্বাসকে কেন্দ্র করেই এ ধরনের কাহিনীর সৃষ্টি।)

এক পাড়াগ্রামে দু ভাই বাস করত। বড়ভাই শিক্ষিত বলে তাকে গ্রামের বিচার-সালিশ করতে হয়। গ্রামবাসী তাকে গ্রামের প্রধান মনোনীত করল। বসে বসে প্রধানের আয় হয়। দিনের পর দিন তার অবস্থা ভাল হতে লাগল। অপর দিকে ছোট ভাই একেবারে মূর্খ। সে কৃষিকাজ করে নিজের জীবিকা নির্বাহ করে। বড়ভাইয়ের ও জমিজমা অনেক গুনে বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্রামের লোকগুলো এসে তার জমি চাষ করে দেয় ফসল ও বুনানী করে দেয়। ওরা পারিশ্রমিক কিছু নেয় না। শুধু ফসল বুনানীর সময় প্রধান সবাইকে খাইয়ে দেয়। একবার বুনানীর সময় বড় ভাই একটা গরু জবাই করে ভোজ খাওয়ালো। ছোটভাইকে ডাকল না। সে নিজেই বড়ভাইয়ের বাড়ীতে হাজির হল কিন্তু তার ভাগ্যে খাবার জুটলি না। তার বৌদি তাকে বলল, "এখন যাও যখন কুকুর ঘেউ ঘেউ করে ডাকবে ঠিক সেই সময় এলে খেতে দিব।" ছোট ভাই আর কি করবে। নিরুপায় হয়ে বাড়ীতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। তিন চার ঘন্টা বাদে কুকুর ডাকতে শুরু করলে তার ঘুম ভাঙল। সে ছুটে গেল দাদার বাড়ী। বৌদি তাকে এঁটো ভাত খেতে দিল। ভাত খাওয়া তার হল না। সেই এঁটো ভাত নিয়ে সে নিজের বাড়ী ফিরে গেল।

ছোট ভাইয়ের ভীষন রাগ হল। দাদার জমিতে সেও সেদিন ধান রোপন করে এসেছিল অথচ তাকে খেতে দেওয়া হল এঁটো ভাত। এ অপমান সহ্য করতে না পেরে সে নিজের রোপন করা ধানের গাছ তুলে ফেলতে গেল মাঠে। সেখানে হঠাৎ এক বুড়ার সঙ্গে দেখা। সে বলল, "ধান গাছ উপড়ে ফেলিও না বরং এখান থেকে পূর্বদিকে বার ক্রোশ রাস্তা হাটলে লক্ষ্মীর সঙ্গে দেখা পাবে, তারপর তোমার যা বলার তাকেই বলবে।" সে লক্ষ্মীর খোঁজে বের হল। পথে পেল একটা আম গাছ আর তাতে অসংখ্য পাকা পাকা আম ঝুলছে। একটা আম পেড়ে যেমনি সে খেতে

গেল অমনি দেখল পোকায় ভর্তি। গাছ তখন মানুষের ভাষায় তাকে জিজ্ঞেস করল, "ও ভাই তুমি যাচ্ছ কোথায়?" সে জবাব দিল, "লক্ষ্মীর সঙ্গে দেখা করতে চলেছি।" গাছ বলল, "আমার সব ফলে পোকা, পশু পাখী এমনকি মানুষ পর্যন্ত কেউ খায় না, এই আমার বড় দুঃখ। তুমি লক্ষ্মীর কাছ থেকে এর কারনটা জেনে আসবে।" সেখান থেকে আবার সে পথ চলতে লাগল। কিছু দূর গিয়ে সামনে এক পুকুর দেখতে পেল। তাতে অল্প জল আর দল-ঘাসে পরিপূর্ণ। সেখানে একটা হাতী সারা দিন ঐ দল আর ঘাস খায় তবুও তার পেট ভরে না। হাতীও নিজের মনের দুঃখ শুনিয়ে তাকে বিদায় দিল। আবার পথে পেল একটা কুলের গাছ। সেই ফলেও পোকা। কুলের গাছও এর কারনটা জানতে চাইল।

দু দিন একটানা পথ চলার পর সে লক্ষ্মীর দেখা পেল। তার কাছে নিজের দুঃখের কথা প্রকাশ করল সে। দেবী বললেন, "তোমার বৌ একদিন আমার দেহে গরম ভাতের মাড় ফেলেছিল তাই আমি তোমার বাড়ি থেকে বিদায় নিয়ে চলে এসেছি। তুমি যখন আমার জন্য এত রাস্তা পরিশ্রম করে এসেছ তবে তুমি বাড়ী ফিরে যাও, আজ থেকে তোমার কোন দুঃখ কষ্ট থাকবেনা।" সে আম গাছ, কুল গাছ, আর হাতীর দুঃখও দেবীকে শুনাল। দেবী বললেন, "আম গাছের গোড়ায় তিন কলসী টাকা রয়েছে সেটা কাউকে দান করলে তবেই সে উদ্ধার পাবে। কুল গাছের নীচেও আছে সাত ঘড়া টাকা মাটি খুঁড়ে কেউ বের না করলে তার মুক্তি নেই। আর হাতীর পিঠে কোন সওয়ার না থাকলে জীবন কোন দিন তার পেট ভরবে না।" লক্ষ্মীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সে বাড়ীর পথে রওয়ানা হল। কুলের গাছ তাকে দেখতে পেয়ে বলল, "ভাই খবর কি?" সে সব কথা শুনে বললে গাছ তাকে সাত ঘড়া টাকা দান করল। এই ভাবে সে আম গাছের গোড়া থেকে তিন কলসী টাকাও তুলে নিল। আর হাতীর পিঠে চড়ে টাকা পয়সা সহ সে নিজের বাড়ীতে পৌঁছালো।

তারপর দিন দিন ছোট ভাই ধনী হয়ে উঠল। বড় ভাইয়ের সংসারে দেখা দিল অভাব-অনটন। একদিন ছোটভাই গ্রামের সবাইকে ভোজ খাওয়ালো। দাদাকে ও নিমন্ত্রন করল সে। সেই দিন সে দাদাকে বৌদির ঠাট্টা ভাত দেখালো। সে কোনরূপ প্রতিশোধ গ্রহন করল না এবং ভালভাবে দাদার আদর আপ্যায়ন করল।

****

।। রাজপুত্র ঘোরণ ।।

(এ লোককাহিনীটি মানভূমের শেরশাহবাদ সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমান সমাজে প্রচলিত। এটি রতুয়া থানার বাবলাবনা দুর্গাপুর গ্রামের মোঃ আলাউদ্দিনের (পিতা শেখ মোসলিম) নিকট থেকে সংগৃহীত। রাজপুত্রের ঘোরণমূর্তি, তার দেশভ্রমণ, খোলস পরিবর্তন, পাথর কাপটায় রাজপ্রাসাদের দেওয়াল ভেঙে যাওয়ার উপক্রম, পরিশেষে রাজকন্যা ও রাজ্যলাভ প্রভৃতি রূপকথার কাহিনীর মত। এধরনের লোককাহিনী অন্যান্য অঞ্চলেও বর্তমান।)

এক রাজার এক ছেলে ছিল। নাম তার ঘোরণ। সে যে কোনো সময় ঘোরণের রূপ ধারণ করতে পারত। একদিন সে মাকে বলল, "মা দেশভ্রমণ করার আমার বড় ইচ্ছে। মা ভাবল আদরের একটা ছেলে তার মনে কষ্ট দিয়ে লাভ কি। সে বলল, "যাও তবে দু এক বছরের মধ্যে অবশ্য অবশ্যই ফিরে এস।" একদিন সকাল বেলায় তৈরী হয়ে রাজার ছেলে বেরিয়ে পড়ল দেশ ভ্রমণে। কোন্ দেশ যাবে কে জানে? কত নদী কত পাহাড় পেরিয়ে সে হাজির হল এক গভীর জঙ্গলে। সেখানে এক-খানা দালানবাড়ি তার নজরে পড়ল। সে ভাবল এখানে নিশ্চয় শহর বাজার আছে। কাছেই ছিল এক পাকুড়ের (অশ্বত্থ) গাছ। সেই গাছে উঠে ঘোরণ নিজের খোলস ডালে রেখে মানুষের রূপ ধরে চলল শহর বাজার ঘুরতে।

রাজপ্রাসাদের পাশ দিয়ে রাজপুত্র একা হেঁটে চলেছে। ওদিকে দোতলায় রাজকন্যা ছেলেটির রূপ দেখে হল [redacted] পাগল। কিছুক্ষণ পরে রাজপুত্রেরও নজর পড়ল সে দিকে। দুজনে চোখাচোখি ইশারায় কত রকমের প্রেমালাপ করল কে খবর কেই বা রাখে? রাজার ছেলে ফিরে এল পাকুড় গাছে। সেখানে ঘোরণ হয়ে উড়ে পৌঁছান রাজকন্যার ঘরে। সারা রাত সোনার পালঙ্কে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দুজনে অনেক গল্প করল। ঠিক ভোরের সময় আবার ঘোরণ হয়ে সে উড়ে গেল নিজের আস্তানায়। রোজ সকাল বেলা রাজকন্যাকে ওজন করা হয়। কোন দিন তার ওজন একচুল বাড়ে ও না কমেও না কিন্তু সেদিন তার ওজন গেল বেড়ে। রাজা রানীর সন্দেহ হল। নিশ্চয় রাতের সময় কোন চোর রাজকন্যার ঘরে ঢুকে পড়েছে। তার পরদিনসকালে আরও বেশী হল। এবার রাজা চোর ধরার জন্য লোক নিয়োগ করলেন। গোপনে রাজকন্যার বিছানায় সিঁদুর ছড়িয়ে দেওয়া হল। কারন চোর এসে বিছানায় বসলে তার কাপড়ে সিঁদুরের দাগ লাগবে আর সেই দাগ দেখে চোরকে

ধরা অনেকটা সহজ হবে।

তৃতীয় রাতে রাজার ছেলের ধুতিতে সিঁদুরের দাগ লাগল। সে টের পেল সকালে। খুব তাড়াতাড়ি সে ধুতি আর জামা খানা দিয়ে এল ধোপার বাড়ী। এদিকে রাজার লোকজন ধোপার বাড়ীতে কাপড় পরীক্ষা করতে গিয়ে চোর ধরা পড়ল। তাকে অনেক মার ধর করা হল। তারপর সে মোরগের মূর্তি ধরে উড়ে গেল রাজপ্রাসাদে। মোরগের পাখার ঝাপটে রাজপ্রাসাদ ভেঙে পড়তে লাগল। রাজা দেখলেন মোরগের সঙ্গে পেরে ওঠা মুশকিল। তিনি তাকে শান্ত হতে অনুরোধ জানালেন। তিনি রাজকন্যার সঙ্গে তার বিয়ে দিতে আর অর্ধেক রাজত্ব দিতে রাজী হলেন। মোরগ শান্ত হল। তারপর আনুষ্ঠানিকভাবে খুব ধুমধামের সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে হল। অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যাকে পেয়ে মোরগ সুখে শান্তিতে দিন কাটাতে লাগল।)

****

।। এক জোলা ও মোড়ল ।।

(এ লোককাহিনীটি মালদহের হরিশ্চন্দ্রপুর ও খরবা এলাকার বাঁশ সম্প্রদায়ভুক্ত মাস মুসলমান সমাজে প্রচলিত থাকলেও জোলাকে কোথাও নির্বোধ আবার কোথাও অতি বুদ্ধিমান হিসাবে দেখানো হয়ে থাকে। এ কাহিনীতে গ্রামের মোড়লকে মূর্খ ও লোভী হিসাবে আমরা দেখতে পাই। সে জোলার কথামত কাজ করতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েছে। অথচ জোলা নিজের বুদ্ধি ও কৌশলে অবস্থা পরিবর্তনে সক্ষম হয়েছে।)

এক গ্রামে এক জোলা ছিল। সে খুব গরীব। বাড়ীতে শুধুমাত্র তার বিধবা মা থাকে। সেও খুব বৃদ্ধা। জোলা অন্য এক গেরস্তের বাড়ী রোজ কাজ করতে যায়। সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরে আসে। তার নিজের একটা গাভী ছিল। সে কাজে যাওয়ার আগে আঙিনায় খুঁটা পুঁতে গাভীটাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখত। কিন্তু দড়িটা ছিল তিনশ হাতের লম্বা। রোজ রোজ গাভী গ্রামের মোড়লের ফসল খেয়ে নষ্ট করে। মোড়ল তো রেগে আগুন। দু'চার দিন তিনি জোলাকে সাবধান করিয়ে দিলেন। জোলা বুঝবে কেন? সে জবাব দেয় আমার গাভী তো রোজ দড়িতে বাঁধা থাকে।

একদিন মোড়ল গাভীকে জবাই করে তার মাংস খেয়ে ফেললেন আর তার চামড়া, পেটের নাড়ি-ভুঁড়ি দড়িতে বেঁধে দিলেন। জোলা সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরে দেখছে তখনও গাভী আসে নি। সে দড়ি ধরে টানতে লাগল কিন্তু একাই সে টানতে পারছে না। শেষে সে হাতে একটা লাঠি নিয়ে বের হল। দেখল দড়িতে ভুঁড়ি আর চামড়া বাঁধা রয়েছে। সে ভাবল, এটা নিশ্চয় মোড়লের কাজ। বেচারা চামড়াটা মাথায় করে বাড়ী নিয়ে এল। পরের দিন শনিবার মধুরাপুরের হাট। সে চামড়া নিয়ে গেল হাটে বিক্রি করতে। সে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বসে থাকল তবুও চামড়া বিক্রি হল না। আবার সে বাড়ীর রাস্তা ধরল। অন্ধকার রাত। তাই সে রাস্তার পাশে এক বট গাছে উঠে রাত থাকল। সাত চোর চুরি করে গভীর রাতে ঐ গাছের তলায় বসে সোনা-দানা, টাকা-পয়সা ভাগ করতে বসল। চোরদের মধ্যে একজন ছিল অন্ধ। ভাগ করার সময় সে গোলমাল বাঁধিয়ে দিল। জোলা গাছের উপর থেকে সব লক্ষ্য করছিল। সে আচমকা চামড়াটা উপর থেকে তাদের উপর দিল ফেলে। যেমনি ফেলা অমনি সাত চোর যে যেদিকে পারল ভয়ে দিল দৌড়। ভোরে জোলা গাছ থেকে নেমে সোনা-দানা, টাকা-পয়সা নিয়ে বাড়ী এল। এবার সোনা-দানা মাপতে হবে। কাঠার দরকার। সে নিজের বৌকে পাঠাল মোড়লের বাড়ী কাঠা আনতে। মোড়ল খুব চালাক। তিনি মনে করলেন জোলার আবার কাঠার দরকার কেন? তিনি তলায় আঠা লাগিয়ে কাঠাটা জোলার বৌকে দিলেন। ওজন করা শেষ হলে সে কাঠাটা ফেরৎ দিয়ে এল কিন্তু সোনা তার তলায় আটকিয়ে ছিল। মোড়ল ভাবল, জোলা এত সোনা পেল কোথায়? তিনি জোলার বাড়ীতে পৌঁছে তাকে সোনার কথা জিজ্ঞেস করলে সে জবাব দিল, "আমার গাভীর চামড়া বিক্রি করে পেয়েছি।" মোড়ল লোভ সামলাতে পারলেন না। তাঁর ছিল একশ গরু। তিনি একে একে সব গরুকে জবাই করে চামড়া ছাড়িয়ে হাটে নিয়ে গেলেন। তিনি হাটের লোকগুলোর মুখে নাকে চামড়া ঠেকিয়ে বললেন খুব ভাল চামড়া। গন্ধে লোকগুলো তো একেবারে অস্থির। সবাই মোড়ল আর তার ছেলেকে বেদম মার ধর করল। মারের ঠেলায় বাপ-বেটা কোন রকমে পালিয়ে রক্ষা পেল।

জোলার কথা মত কাজ করতে গিয়ে ঠগা পড়েছেন ভেবে মোড়ল রাগে জোলার ঘরে আগুন ধরিয়ে দিয়ে পুড়িয়ে দিলেন। জোলা তখন বাড়ীতে ছিল না। সে গিয়েছিল গেরস্তর বাড়ী কাজ করতে। সেখান থেকে সে যখন বাড়ী ফিরে এল তখন দেখল তার বাড়ী পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। মোড়লের উপর প্রতিশোধ নেওয়ার ক্ষমতা ও তার নেই। সে একটা খালি চটের বস্তায় ছাইগুলো ভরে হাটে নিয়ে

গেল বিক্রি করতে। কিন্তু ছাই তো আর বিক্রি হওয়ার জিনিষ নয়। সে বস্তাটাকে মাথায় তুলে বাড়ীর রাস্তা ধরল আবার আগের বারের মতো বটগাছের উপরে রাত থাকতে হল। ঐ সাত চোর সেই রাতে চুরি করে আবার সোনা, চাঁদি ভাগ করছে। ভাগ নিয়ে অন্ধ চোর সে বারের মতো আবার গন্ডগোল বাঁধিয়ে দিল। জোলা ঝোপ বুঝে কোপ মারল। সে চোরদের মাথার উপর ছাইয়ের বস্তা দিল ফেলে অমনি সব ছেড়ে চোরেরা দে দৌড়। সেদিনও জোলা সোনা চাঁদি নিয়ে বাড়ী পৌঁছালো। মোড়ল আবার জোলার বৌয়ের কাছ থেকে এ খবর জানতে পায়। তিনি জোলাকে জিজ্ঞেস করলেন, '' ভাই এ সোনা চাঁদি তুমি পেলে কোথায়?'' জোলা জবাব দিল, '' বাড়ীর ছাই বিক্রি করে পেয়েছি।'' মোড়ল ভাবলেন তাঁর তো বিশ বার খানা ঘর পুড়িয়ে দিলে অনেক সোনা চাঁদি পাওয়া যাবে। তিনি নিজের সব ঘরে আগুন ধরিয়ে পুড়িয়ে দিলেন। ছাই নিয়ে চললেন হাটে। কিন্তু বিক্রি হবে কেন? তিনি বস্তা ফেলে দিয়ে খালি হাতে বাড়ী ফিরে এলেন।

মোড়ল এবার জোলার উপর দ্বিগুন রেগে গেলেন। একদিন তিনি তাকে ধরে বস্তায় ভরে মুখ বন্ধ করে দিয়ে নদীতে ফেলে দিলেন। কিন্তু রাখে হরি মারে কে? জলের ঢেউয়ের ধাক্কায় বস্তাটা নদীর ধারে এসে ভিড়ল। সে সময় কতগুলো রাখাল সেইখানে ছিল। তারা বস্তার বাঁধন খুলে তাকে উদ্ধার করল। সে তখনও মরে নি। রাখাল রা খড়কুটো জড়ো করে তাতে আগুন ধরিয়ে তাঁর ঠান্ডা শরীরকে একটু গরম করল। জোলা অল্পক্ষনের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠল। রাখালেরা তাকে বলল, '' ভাই তুমি একটু আমাদের গরু গুলো দেখ আমরা ততক্ষন বাড়ী থেকে খেয়ে আসি।'' গরুগুলো তার দায়িত্বে ছেড়ে দিয়ে ওরা নিজেদের বাড়ী গেল আর এদিকে জোলা সাত আটটা ভাল গাভী দেখে ফাঁকতালে নিজের বাড়ীতে হাজির। মোড়ল দেখল ভারী আশ্চর্য্য ব্যাপার, জোলাকে নদীতে ফেলে এলাম আর কিনা সে এতগুলো গাভী নিয়ে হাজির। সে বলল, '' মোড়ল, আমি নদীর তলায় পাতাল রাজার কাছ থেকে গাভী গুলো দান পেয়েছি।'' মোড়ল তাকে অনুরোধ করে বলল, '' ভাই, আমাকেও বস্তাতে ভরে নদীর জলে ফেলে দাও।'' জোলা তাই করল। মোড়ল নদীর জলে ডুবে প্রাণ হারালো। জোলা মোড়লের যন্ত্রনা থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে সুখে শান্তিতে বসবাস করতে লাগল।

।। বিমাতা ও রাজপুত্র ।।

(এ কাহিনী টি মালদহ জেলার দুরবর্তীয় মুসলমান সমাজে প্রচলিত । এটি মানিকচক এলাকার মোহনা গ্রামের সেখ সারাফত আলির (পিতা মৃত সেখ তুরাব আলি) নিকট থেকে সংগৃহীত । সমাজে বিমাতার হাতে ছেলে মেয়েদের অনেক জ্বালা-যন্ত্রনা ভোগ করতে হয় । ভিতরে ভিতরে চলতে থাকে বিমাতার ষড়যন্ত্র । নানাভাবে ছেলে মেয়ের জীবন নাশের চেষ্টাও চলে । একমাত্র ভাগ্যের জোরেই তারা রক্ষা পায় । আর রাজার ছেলে রাজকন্যাকে বিয়ে করে সুখে স্বচ্ছন্দ দিন কাটাতে থাকে । আসলে রাজকন্যাকে বিয়ে করার অর্থ অতি ভাগ্যবান ।)

আমাদের দেশে এক রাজা ছিলেন । তার এক রানী ও দু ছেলে । বড় ছেলে অজ আর ছোট ছেলের নাম দুলাল । সুখে শান্তিতে রাজা রাণীর দিনগুলো কেটে যায় । রাজপুত্র দুটো এখনও পর্যান্ত শিশু । রাজ প্রাসাদের পাশেই ছিল এক তেঁতুল গাছ । সেই গাছে বাসা করে এক বক ও তার স্ত্রী থাকত । দেখতে দেখতে বকের দুটো বাচ্চা হল । রাণী রাজ প্রাসাদের উপর থেকে রোজ বকের বাসারদিকে লক্ষ্য রাখত । অল্পদিনের মধ্যে বকের স্ত্রী মারা যায় । তারপর বাচ্চা দুটোকে পালন করার জন্য খুব শীঘ্রই বক বিয়ে করে স্ত্রী বককে ঘরে আনল । কিন্তু তার ফলটা হল উল্টা । তার জ্বালা যন্ত্রনায় বাচ্চা দুটোকে জীবন হারাতে হল । রানী ভাবলেন " হয়তো একদিন এরকম দশা আমার ও আমার ছেলেরও হতে পারে " । তাই তিনি এর উপায় খুঁজতে লাগলেন । তিনি স্থির করলেন, " ঘরের দরজা বন্ধ করে না খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে থাকলেন । দাস দাসীরা রানীকে দরজা খুলতে বলল কিন্তু রানী এত সহজে দরজা খুলে দিবেনই বা কেন ? খবরটা রাজার কানে পৌঁছালো । তিনি ছুটে এলেন । রানী তখন ঘরের ভিতর কাঁদছে । রাজা তাকে দরজা খুলতে বললেন । রানী জবাব দিলেন আগে আমার সঙ্গে সত্যবন্দী কর তবেই দরজা খুলব । রাজা রাজী হলেন । দরজা খুলে স্বামীকে বললেন " আমি মরে গেলে তুমি দ্বিতীয় বিয়ে করতে পারবে না আর তুমি মরলেও আমি দ্বিতীয় স্বামী গ্রহন করব না " ।

এইভাবে বেশ কিছুদিন ছেলেদের নিয়ে রাজা রানী খুশী মনেই চললেন । তারপর একদিন হঠাৎ রানীর মৃত্যু হয় । প্রথম কিছুদিন রাজা রানীর সত্যবন্দীর কথা মনে রেখেছিলেন কিন্তু দু এক বছর যেতে না যেতেই তিনি সব

গেলেন ভুলে। তিনি নূতন রানীর খোঁজ নিতে পাঠালেন মন্ত্রীকে। খুব শীঘ্রই নূতন রানীকে বিয়ে করে রাজা রাজপ্রাসাদে নিয়ে এলেন। নূতন রানী নিজের বাবার বাড়ী থেকে একটা কাঠের বাকসসঙ্গে এনেছিলেন। রাজার সঙ্গে কথা হল বাকসটা রানী ছাড়া অন্য কেউ খুলতে পারবে না কিংবা তার ভিতরের জিনিষ দেখতেও পারবে না। বিমাতা অজং আর দুলালকে খুব স্নেহ করে। রোজ স্কুলেও পাঠায়। রাজপুত্র দুজন নূতন রানীর আদর যত্নে বড় হতে লাগল।

বিয়ে করার আগে এক ঘোড়া ঘাসীর সঙ্গে রানীর প্রেম ছিল। তিনি সঙ্গে যে বাকস এনেছিলেন তার ভিতরে ঘোড়াঘাসীকে লুকিয়ে রেখেছিলেন। রাজপ্রাসাদে রানী গোপনে গোপনে নিজের প্রেমপিপাসা মিটাতেন। যেভাবেই হোক একদিন অজং বিমাতাকে ঘোড়াঘাসীর সঙ্গে প্রেমালাপ করতে দেখে। রানীও অজংকে দেখতে পায়। রানী মহা বিপদে পড়লেন। তিনি চিন্তা করলেন এই ছেলের মুখ দিয়েই তাঁর কলঙ্ক ছড়িয়ে যাবে। দিন রাত বসে বসে ভাবতে লাগলেন," কিভাবে ছেলে দুটোকে একেবারে সরিয়ে দেওয়া যায়।" তিনি বিছানার নিচে পাট খড়ি রেখে ঘুমিয়ে অসুখের ভান করলেন। রাজা ছুটে এলেন। বললেন," রানী তুমি কোন্ অসুখে কাতর হয়েছ?" রানী একবার এপাশ - ওপাশ ঘুরলেন তাতে বিছানার পাট খড়ি মড় মড় শব্দ করে উঠল। রানী বললেন," স্বামী আমার হাড়ের রোগ হয়েছে।" এর কোন অসুধ নেই। তবে বড় ছেলে অজং এর কলিজা খেলেই এ রোগটা ভাল হবে নচেৎ আমি অল্প দিনের মধ্যেই মারা যাব।" রাজা ভাবলেন এত সুন্দরী রানী এত তার রূপের বাহার। যেভাবেই হোক তার অসুখটা ভাল করতে হবে। তিনি জল্লাদকে হুকুম দিলেন," অজংকে কেটে তার কলিজা নিয়ে এস"। জল্লাদ অজংয়ের হাত বেঁধে রাজপ্রাসাদ থেকে দূরে এক জঙ্গলে হাজির হল। রাজপুত্র জল্লাদের সামনে কেঁদে কেঁদে বলতে লাগল,-" জল্লাদ কেটো না কেটো না আমারে, কি দোষে কাটিবে আমারে গো, কলঙ্কিনী মা আমারে বিনা দোষে

মারিল জীবনে"।

ছেলেটির মুখে সব বিবরণ শুনে জল্লাদের দয়া হল। সে তাকে ছেড়ে দিল। তার পরিবর্তে সে একটা ছাগলের কলিজা বের করে রাণীকে খাওয়ালেন।

এদিকে অজং জল্লাদের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে দু ভাই বাবার রাজ্য ছেড়ে অন্য দেশে রওয়ানা হল। কত মাঠ কত গ্রাম পার হয়ে তারা এক গভীর জঙ্গলে এসে পড়ল। ছোট ভাই দুলাল আর এক পাও চলতে পারছে না তার ভীষণ তেষ্টা পেয়েছে। অজং ভাইকে এক বটগাছের তলায় বসিয়ে বের হল জলের সন্ধানে। অনেক দূরে গেলেন

সে একটা শহর । সেই শহরে সেদিন ঐ দেশের রাজার মেয়ের স্বয়ম্বর সভা । দেশ বিদেশ থেকে যত রাজপুত্র এসেছে সেখানে তার সংখ্যা হিসেব করে বলা মুশকিল । ভজু স্বয়ম্বর সভার কিছু দূরে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল । রাজকন্যার দেওয়া মালা শুঁড়ে নিয়ে হাতী ঘুরতে পরিয়ে দিল ভজুয়ের গলায় । কে জানে পথের পথিক ভজুয়ের সঙ্গে রাজকন্যার হবে বিয়ে । সে ছোট ভাই দুলালের কথা একেবারে ভুলেই গিয়েছিল । সিপাহীরা জেলে গিয়ে দুলালকে নিয়ে এল । ভজু হল ঐ দেশের রাজা । রাজা হয়ে দুভাই বেশ কিছুদিন রাজত্ব করার পর আবার নিজের দেশে ফিরে গেল ।

- - - - - - - - - - - -

।। ছয় ভাই ও বিজু বোন ।।

(এ লোককাহিনী টি মালদহের শেরশাহ বাদ ও বৈচি সম্প্রদায় ভুক্ত মুসলমান সমাজে প্রচলিত । ঐটি কালিয়াচক থানার মেহেরাপুর ছবিলপাড়া গ্রামের আব্দুল রহমানের (পিতা মৃত মোমন সেখ) নিকট থেকে সংগৃহীত । সমাজে জা ও ননদের মধ্যে কোনদিন বনিবনা হয় না । উভয়ের মধ্যে হিংসা ও চক্রান্ত দিন দিন দানা বেঁধে ওঠে । এ কাহিনীতে ছয় জায়ের চক্রান্তে বিজুর মর মর অবস্থা । ভাইরা এসে বোনকে উদ্ধার করে । চক্রান্তের শাস্তিস্বরূপ ছয় ভাই নিজেদের বৌকে চিরদিনের মত সরিয়ে দিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে দিন কাটাতে থাকে ।)

কোন এক গ্রামে ছয় ভাই ও তাদের এক বোন ছিল । তার নাম বিজু । সবাই তাকে বিজু বোন বলে ডাকত । একবার ছয় ভাই বাণিজ্য করতে যাবে স্থির করল । কিন্তু সমস্যা হল এত আদরের বোনকে ছেড়ে তারা যাবেই বা কি করে ? তারা নিজেদের বৌকে হুঁশিয়ার করে বলল ,'' খবরদার তোরা বিজু-বোনকে কোন রকম কষ্ট দিস না ।'' শুভ যাত্রা দেখে ছয় ভাই একদিন নদী পথে বেরিয়ে পড়ল । পর পর ছয় ডিঙার দৃশ্য কতই না মনোহর । তারা অনবরত ছয় মাস ডিঙি চালিয়ে অনেক দূর দেশে পৌঁছালো । এদিকে ছয় (গোষ্ঠী) জা ননদ বিজু বোনকে ভাল নজরে দেখতেই পারে না । ছয় ভাইয়ের বৌ একসঙ্গে পরামর্শ করে বিজু বোনকে পাঠান গভীর বনে বাঘের দুধ আনতে । তারা বলল ,'' বিজু , বাঘের দুধ আনতে না পারলে তুই খাওয়ার পাবি না অনাহারেই থাকতে হবে ।'' বিজুকে বাধ্য হয়ে যেতে হল গহন বনে , যেখানে

সব রকম হিংস্র জানোয়ারের বসবাস । সেখানে হাজির হয়ে সে কেঁদে বলতে লাগল "ছ ভাই বানিজ্যে গেল ছ গোষ্ঠী দুঃখ দেল দাদাগো বিজুবন কাঁদে অর্জুন বন-জঙ্গলে'।" বাঘ তার কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, "বিজুবোন তুমি কাঁদছো কেন?" বিজুবোন নিজের দুঃখের কথা শুনালে বাঘ তাকে দুধ দিয়ে বাড়ী পাঠালো । ছয় জা দেখল বিজু এখনও মরে নি । তাদের ধারনা ছিল বাঘের দুধ আনতে বনে গেলে তাকে বাঘ খেয়ে ফেলবে । আবার ছয় জা মিলে বুদ্ধি আঁটল। তারা বলল," বিজু খাবার তো থালা নেই যাও তেঁতুল পাতা নিয়ে এস সেই পাতায় তোকে খেতে দিব ।' সে তেঁতুল পাতা আনলে তাকে অল্প একটু খেতে দেওয়া হল ।

এইভাবে ভীষন দুঃখ কষ্টের মধ্যে বিজুবোনকে দিন কাটাতে হল । একদিন ছয় জা মিলে তাকে পাঠাল জঙ্গলে বিনা বাঁধনের এক বোঝা খড়ি আনতে । সে অনেক পরিশ্রম করে এক বোঝা খড়ি যোগাড় করল বটে কিন্তু সেটাকে দড়ি দিয়ে না বাঁধলে যাবেই বা কি করে ? বিজু বসে কাঁদতে কাঁদতে বলল," ছ ভাই বানিজ্যে গেল ছ গোষ্ঠী দুঃখ দেল দাদাগো বিজুবোন কাঁদে অর্জুন বন জঙ্গলে । তার কান্না শুনে একটা ভাঁড়োল (ধামনা) সাপ জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, "বিজু বোন তুমি কাঁদছ কেন?" তার মুখে সব শুনে সাপ খড়ির চারিদিকে লাপটে গেল । বিজুবোন অনায়াসে বিনা বাঁধনের খড়ি নিয়ে বাড়ী এল । তার ভাবীরা তো অবাক । তারা মহা ফাঁপরে পড়ল । বিজুবোনকে জব্দ করার কি কোন উপায় নেই ? তারা একের পর এক চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগল । এক সের সরিষা জমিতে ছিটিয়ে দিয়ে বলল," বিজু, কুড়িয়ে আন, ওজনে যেন একটুও কম না হয় । এক তিল ওজন কম হলে আজ থেকে তোকে খেতে দেওয়া হবে না ।" সরিষাকে কুড়িয়ে জড়ো করা বিজুবনের পক্ষে কোনমতেই সম্ভব নয় । সে জমিতে বসে কাঁদতে লাগল । এক ঝাঁক পায়রা এসে বলল," ভাবনা কি বিজুবোন আমরা তোকে সাহায্য করব ।" সব পায়রা এক এক সরিষার দানা কুড়িয়ে দিল । বিজুবোনের ভাবীরা ওজন করে দেখল এক সের থেকে এক তিলও কমে নি ।

শেষে ছয় জা মিলে বিজুবোনকে মেরে ফেলার নূতন কৌশল অবলম্বন করল । তারা বলল," বিজু চল আমরা সবাই ডুমুর ভেঙে নিয়ে আসি। গ্রামের শেষ প্রান্তে বেশ খানিক দূরে ছিল ডুমুর গাছ । গাছটা অনেক বড় । গাছে না উঠলে ডুমুর ফল ভাঙা একেবারে অসম্ভব । কিন্তু ছয় ভাবীর মধ্যে কেউ রাজী হল না । গাছে উঠতে হল বিজুবোনকে । এদিকে তার ছয় ভাবীরা

গাছের গোড়া থেকে কাণ্ড বরাবর কাঁটা দিয়ে এমনভাবে ঘিরে দিল যাতে কোন উপায়েও বিজু বোন মাটিতে নামতে না পারে। বিজু বোনকে গাছের উপরে বন্দী রেখে ছয় জনে বাড়ী ফিরে এল। ননদকে নিজেদের কাছ থেকে সরিয়ে দিয়ে তারা কতই না আনন্দিত। ছ বছর থেকে বিজু বোন গাছের উপরেই আছে। না খেয়ে দেয়ে তার শরীরটা শুধু হাড় হয়ে গেছে তবুও সে মরে নি কোন রকমে বেঁচে রয়েছে। ছ ভাই বাণিজ্য থেকে ফিরে এসে রাত বারোটার সময় ঐ ডুমুর গাছ তলায় আশ্রয় নিল। সকাল হলেই বাড়ীর পথে রওয়ানা হবে। ছ ভাই বসে আছে এমন সময় গাছের উপর থেকে বিজু বোনের এক ফোঁটা চোখের জল এসে পড়ল ছোট ভাইয়ের উপর। সকালে সে গাছে উঠে বিজু বোনকে নামিয়ে সাবান দিয়ে স্নান করিয়ে দিল। তারপর জামা কাপড় পরিয়ে পেট ভরে খাওয়ালো। তারা ছভাই তখনও পর্যন্ত বিজু বোনকে চিনতে পারে নি। তারা তাকে নিকটবর্তী এক জঙ্গলে লুকিয়ে রেখে বাড়ী পৌঁছালো। ওখানে তারা বৌদের জিজ্ঞেস করল, "বিজু-বোন কই?" তারা জবাব দিল, "সে মরে গেছে আমরা তাকে ডুমুর গাছের তলায় কবর দিয়েছি।" তারপর ছভাই লোকজন দিয়ে একটা ইন্দারা খুঁড়ল। তারা বৌদের বলল, "আমরা বাণিজ্য করে অনেক ধন দৌলত এনেছি ঘরে রাখলে চোর ডাকাতের ভয় তাই সব ধন ইন্দারায় পুঁতে রাখব।" এদিকে এক ভাই জঙ্গল থেকে বিজু বোনকে ডেকে নিয়ে বাড়ী এল। ছভাই ভাবল, শয়তানী বৌদের মেরে ফেলাই উচিৎ। তারা তাদের বলল, "চল তোমরা ছ বৌ মিলে ইন্দারা চুমিয়ে এস তারপর ধন পুঁতা হবে।" ইন্দারা চুমানোর বিধির সময় চুপচাপ ছভাই তাদের ধরে উল্টিয়ে ফেলল একেবারে ইন্দারার ভিতর। তাড়াতাড়ি উপর থেকে মাটি চাপা দিয়ে তাদের চিরদিনের মতো মাটির নিচে করে দেওয়া হল। এর-পর ছ ভাই ও বিজু বোন সুখে শান্তিতে দিন যাপন করতে লাগল।

****

।। সোনাপুরের রাজকন্যা ও চার বন্ধু ।।

(এ লোককাহিনীটি হরিশ্চন্দ্রপুর ও খরবা এলাকার ধীমান সম্প্রদায় ভুক্ত মুসলমান সমাজে প্রচলিত থাকলেও এ ধরনের রূপকথা প্রায় সব অঞ্চলেই বর্তমান। দৈত্য দানব, রাজপুত্র, রাজকন্যা যাদুমন্ত্র ইত্যাদি বিষয় রূপকথার কাহিনীতে স্থান পেলেও এর মধ্যে সমাজের লোক-বিশ্বাস বিদ্যমান।)

রাজার ছেলে উজিরের ছেলে কামারের ছেলে আর স্বর্ণকারের ছেলে চারজন খুব বন্ধু। তারা এক সঙ্গে লেখাপড়া করে। দেখতে দেখতে চার বন্ধু বড় হয়ে উঠল। একদিন রাজার ছেলে তিন বন্ধুকে বলল, "চল আমরা সোনা-পুর দেশ বেড়িয়ে আসি।" অনেক দিনের এই রাস্তা। রাজার ছেলে নিল চারটা ঘোড়া, উজিরের ছেলে চারটা বান, কামারের ছেলে চারটা তলোয়ার আর স্বর্ণকারের ছেলে চারটা আংটী সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। যেতে যেতে এক গভীর বনে তাদের রাত কাটাতে হল। সেখানে বাঘ ভাল্লুক, রাক্ষস কত রকমের হিংস্র জীবজন্তুর বাস। রাজার ছেলে তলোয়ার নিয়ে জেগে থাকল আর অন্য তিন বন্ধু নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে রইল। রাত কি ঠিক দেড়টার সময় এল এক বিরাট রাক্ষস। রাজার ছেলে রাক্ষসকে মেরে ফেলার জন্য তার পিছু ধাওয়া করল। বেশ খানিক দূরে গিয়ে শুরু হল দুজনের লড়াই। শেষ পর্যন্ত রাজপুত্রের তলোয়ারের আঘাতে রাক্ষসের মুণ্ড দেহ থেকে খসে পড়ল। রাজপুত্র মৃত রাক্ষসের দেহের উপর ঘুমিয়ে গেল। সকালে উঠে তিনবন্ধু দেখল রাজার ছেলে নেই। খুঁজল অনেক কিন্তু কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। অগত্যা তিন বন্ধু সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে পৌঁছালো এসে এক সন্যাসীর আশ্রমে। ভাত, ডাল, তরকারী রান্না করে তিন বন্ধু মিলে খেলো আর এক ভাগ খাবার রেখে দিল সন্যাসীর কাছে রাজপুত্রের জন্য। সন্ন্যাসী তাদের জিজ্ঞেস করল, "বাবা তোমরা যাবে কোথায়?" তারা বলল, "আমরা সোনাপুর দেশে যাব। আমাদের আর এক বন্ধু কোন দিকে গেছে জানি না তবে যদি এখানে কোনদিন এসে পৌঁছে তাহলে দয়া করে তাকে আমাদের খবরটা জানিয়ে দিবেন।" সন্ন্যাসী বলল, "বাবা এখান থেকে দুটো রাস্তা চলে গেছে সোনাপুর দেশে। একটা রাস্তা বার বছরের আর এক রাস্তা বার দিনের। তোমাদের পছন্দ মত একটা রাস্তা বেছে নাও তবে বলে রাখি বার দিনের রাস্তায় বিপদ অনেক বেশী।" তারা তিন বন্ধু বার বছরের রাস্তা ধরেই রওয়ানা হল।

দু একদিন বাদে রাজার ছেলেও এসে পৌঁছালো সন্ন্যাসীর আশ্রমে। তাঁর মুখ থেকে সে বন্ধুদের সব খবরই পেল। খাওয়া দাওয়ার পর একটু বিশ্রাম করে রাজার ছেলে বার দিনের রাস্তা ধরে রওয়ানা হল সোনা পুর দেশে। কিছু দূর যেতে না যেতেই দেখা হল এক বিরাট অজগর সাপের সঙ্গে। রাজপুত্র বলল, "আমাকে খেয়ে যদি হজম করতে পার তবে খাও, নচেৎ রাস্তা ছেড়ে দাও।" অজগর সাপ তার রাস্তা ছেড়ে দিল। তারপর সামনে এসে হাজির এক বাঘ। মানুষের গন্ধ

পেয়ে খাওয়ার জন্য ছুটে এসেছে সে। রাজপুত্র হাতের তরবারী দেখিয়ে বলল "অজগর তো আমাকে খেতে পারে নি আর তুমি কি ?" তার ভয়ে বাঘ পালিয়ে গেল। এইভাবে সে রাক্ষস ও জটায়ু পাখীর হাত থেকে মুক্তি পেয়ে পৌঁছাল সোনাপুর দেশে। সোনাপুর দেশে একসময় শহর, রাজার লোকজন সব কিছুই ছিল আজ শুধু পড়ে রয়েছে ফাকা রাজ প্রাসাদ। রাজপুত্র রাজপ্রাসাদের দো মহল্লায় দেখতে পেল বায় বেণী কন্যাকে। রাজকন্যা বলল, "পালিয়ে যাও। এই দেশে এক দৈত্য বাস করে। সে আমাকে বাদ দিয়ে আর সব জীবজন্তু মানুষকে খেয়ে ফেলেছে। সে এখুনি এসে পৌঁছুবে।" রাজপুত্র কি করবে ভেবে পেল না। রাজকন্যা বলল, "আশে পাশে অনেক মানুষ ও জীবজন্তুর হাড় জড়ো হয়ে পড়ে রয়েছে তার মধ্যে লুকিয়ে থাক। দৈত্য চলে গেলে আবার তুমি বেরিয়ে আসবে।" রাজপুত্র তার কথামতই কাজ করল। দৈত্য বেরিয়ে গেলে সে রাজকন্যার কাছে এসে নানান ধরনের গল্পগুজব চালিয়ে যেতে লাগল। তার একমাত্র চিন্তা কেমন করে দৈত্যকে মেরে ফেলা যায়। কিন্তু খুব সহজে তাকে বধ করাও শক্ত। রাজকন্যা বলল, "সাত সমুদ্র কমক দরিয়ার এক নদী পারে শিমুলের গাছ আছে। তার ডালে ডালে কাল নাগিনী সাপ ভর্তি রয়েছে। তার মাঝখানে একটা কাকের বাসা। সেই কাকের ভিতরে আছে দৈত্যের প্রাণ"।

রাজপুত্র রাজকন্যাকে না জানিয়ে চুপচাপ বেরিয়ে গেল দৈত্যকে মারার জন্য। কোথায় সেই সাত সমুদ্রের কমক দরিয়া আর কোথায় বা সেই শিমুল গাছ। একাই হেঁটে হেঁটে কয়েক দিন পর সে সত্যি সত্যিই পৌঁছে গেল নির্দিষ্ট স্থানে। তার পাশেই এক বন। সেই বনে আছে এক বুড়ীর কুটীর। সেখানে বুড়ীর সঙ্গে ধরম মায়ের সম্পর্ক পেতে আশ্রয় পেল। তাকে সে পাঁচ শ' টাকা দিল বাজার করতে। বুড়ী তো খুব খুশী। রান্না শেষ হলে দুজনে বসল খেতে আর সেই সঙ্গে রাজপুত্র শুরু করল "আচ্ছা ধরম মা দৈত্য মেরে ফেলার উপায় কি ?" বুড়ী বলল, "সোনার কাঠ এনে তিন শ' মনের নৌকা আর শিমুল কাঠের বৈঠা তৈরী করতে হবে। বাজার থেকে কিনে আনতে হবে এক মন ধানের খৈ ও দুশ' মন দুধ।" তার কথামত সব জিনিস সংগ্রহ করাও হল। ধরম মা তার ডান হাতে বেঁধে দিল একটা তাবিজ। এবার ভয়ের কোন কারন রইল না। বুড়ী বলল, "দুধ আর খৈ এক সাথে মিশিয়ে ঐ শিমুল গাছ থেকে তিন মাইল দূরে মাটিতে ঢেলে দিলে সব সাপ ছুটে আসবে খাবার দেখতে পেয়ে। তুমি সেই ফাঁকে কাককে ধরে জীবন থেকে শেষ করতে পারবে।" রাজার ছেলে ধরম মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলল দৈত্য

মারতে । খুব অল্প সময়ের মধ্যে দৈত্য মারাও পড়ল । সে মহানন্দে রাজকন্যার কাছে ছুটে এসে বলল, "আর কোন ভয় নেই দৈত্য মারা পড়েছে।" রাজকন্যা তাকে স্বামী হিসাবে গ্রহন করল । কিছু দিন পর বার কেশী কন্যা গেল নদীর ঘাটে স্নান করতে । ঐ সময় একটা চুল উপড়ে এল তার হাতে । সে একটা সোনার কৌটাতে বার হাতের চুলটা ভরে দিয়ে ভাসিয়ে দিল নদীর জলে । দু-চার বছরের পর একদিন বোগদাদের এক সওদাগর নদীর ঘাটে এসে সেই সোনার কৌটা কুড়িয়ে পান । তিনি রাজকন্যাকে বিয়ে করার জন্য পাগল হলেন । কিন্তু কোথায় বা কোন দেশে বার কেশী কন্যার বাড়ী, কে জানে? বোগদাদের এক কুটনী বুড়ী সওদাগরের কাছ থেকে একটা নৌকা আর ছ বছরের খোরাক নিয়ে ছুটল সোনাপুর দেশ । সেখানে হাজির হয়ে রাজকন্যার সঙ্গে মা ও মেয়ের সম্পর্ক পেতে খোশ গল্প গুজব করার সুযোগ পেল । রাজপুত্রের জীবন ছিল তলোয়ার খানিতে । বুড়ী কৌশলে এ খবরও রাজকন্যার কাছ থেকে জেনে নেয় । একদিন রাজপুত্র বের হল শিকারে । তলোয়ার খানা সে রাজকন্যার হাতে সঁপে দিয়ে হেফাজতে রাখতে বলল । বুড়ী তো সুযোগের অপেক্ষায় ছিল । সে ঐ ফাঁকে তলোয়ার খানা নিজের হাত করে গোপনে আগুন ধরিয়ে পুড়িয়ে দিল । রাজপুত্র গেল মরে । এদিকে বুড়ী রাজকন্যাকে বলল, "চল মা, নদীতে স্নান করে আসি ।" যেই ঘাটে যাওয়া অমনি বুড়ী রাজকন্যাকে নৌকাতে উঠিয়ে পাড়ি দিল বোগদাদ শহরে । বুড়ী যাদু জানত। সে ছয় বছরের রাস্তা মাত্র ছয় দিনে গেল পৌঁছে । সওদাগর রাজকন্যাকে হাতে পেয়ে তো খুব খুশী । কিন্তু রাজকন্যার চোখে ঘুম নেই । সে কেবল রাজপুত্রের কথা চিন্তা করে করে রোগা হয়ে পড়ল । রাজকন্যা সওদাগরকে বলল, "একমাস ধরে গরীব, দুঃখী ও ফকিরদের খানা খাওয়াবার আমার খুব ইচ্ছে । আপনি এর সব ব্যবস্থা করে দিন ।" সওদাগর ফকিরি খানার ব্যবস্থা করলেন। কত দূর দূরান্ত থেকে গরীব দুঃখী ও ফকিররা রোজ খেয়ে যায় । একদিন এসে পৌঁছালো রাজপুত্রের তিন বন্ধু । রাজকন্যাকে তারা চিনতে পারে নি বটে কিন্তু তার হাতের আঙুলে রাজপুত্রের নামাঙ্কিত আংটীটা দেখে চিন্তা করল সওদাগর হয়তো কন্যাকে চুরি করে এনেছে । একটা কাঠের চৌকীতে বসেছিল রাজকন্যা আর সওদাগরের তিন মেয়ে । উজীরের ছেলে ছুঁড়ে মারল চারটা বান সঙ্গে সঙ্গে শূন্য পথে উড়ে চলল চৌকি সোনাপুর দেশ । সওদাগর তাকিয়ে হায় ! হায় ! XXXXXXX করতে লাগল । তারপর কামারের ছেলে ঐ পোড়া তলোয়ার নূতন করে বন্ধুকে জীবিত করলেন । রাজকন্যা রাজপুত্রকে ফিরে পেল । অন্য তিন বন্ধু সওদাগরের তিন মেয়েকে বিয়ে করে সুখে শান্তিতে

সোনাপুর দেশে বসবাস করতে লাগলেন। ধীরে ধীরে সেই দেশে শহর, বাজার গড়ে উঠল আর আগেকার মত লোকজনের সমাগমে দেশটা জমজমাট হল।

....

।। নির্বোধ রাখাল ।।

(এ লোক কাহিনীটি মালদহের রতুয়া এলাকাধীন শেরশাহবাদ সম্প্রদায়ভুক্ত বাবলাবনা দুর্গাপুর গ্রামের মোসাম্মৎ হেনারা খাতুনের (পিতা সেখ নুরুমান) নিকট থেকে সংগৃহীত। এ কাহিনীতে রাখাল ভাগ্যবান হবার সুযোগ পেয়েও নির্বুদ্ধিতার জন্য চিরজীবনের মত নিজের সমাজ ছেড়ে পরীর রাজ্যে আটক হয়ে রইল।)

এক গ্রামে মোটা বুদ্ধিসম্পন্ন এক রাখাল ছিল। তাকে সবাই বোকা রাখাল বলে ডাকত। সে ঐ গ্রামে এক গেরস্তের বাড়ীতে কাজ করে ও মাঝে মাঝে মাঠে গিয়ে মালিকের গরু চরায়। কোন বেতন নেই, তিন বেলা পেটে খেতে পায় মাত্র। একদিন সে দেখল মাঠের অন্যান্য রাখালেরা জলশয়ে ডারাকি বসিয়ে মাছ ধরছে। সেও সকলের পিছনে একটা ভাঙা ফুটা ডারকি বসিয়ে দিল। কিন্তু এ কী হল? নির্বোধ রাখালটাই বুঝি অতি ভাগ্যবান। কারন তার ডারকি বাদে আর কারো ডারকিতে মাছ নেই। এক সের দু সের নয় দেড় মনের বড় বড় মাছ উঠল। গেরস্তকে সব কটা দিল রান্না করতে। সে দিন সে মাছ ভাত খেয়ে খুব খুশী। পরের দিন তার ইচ্ছে হল সে পাখীর মাংস খাবে। তাই এবার ডারকিটা বসাল গিয়ে মহুয়া গাছের ডালে। রাত বারটার সময় সেখান দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল এক দেউ পরীর কন্যা। সে ডারকির মধ্যে আটকা পড়ল। দেউ পরীরা সাত বোন। ছোট পরীটারই আজ এ অবস্থা। সে পাখীর রূপ ধরে ডারকির মধ্যে চুপচাপ বসে রইল। সকালে এসে রাখাল তো আনন্দে আটখানা। ভাবল আজ মজা করে মাংস খেতে হবে। পাখী মানুষের ভাষায় বলল, "তুমি আমাকে খেও না। তোমাকে এই গাছতলায় একটা দালান বাড়ী তৈরী করে দিব আর বিয়ে করে আমিও তোমার সঙ্গেই থাকব।" রাখাল তাকে মুক্তি দিল।

এদিকে সাত বোন পরী রাতারাতি এসে দালান তৈরী করে দিল। ছ ছোট বোনের সঙ্গে তার বিয়ে হল। ছ বোন রাখালকে জিজ্ঞেস করল, মুখ নিবা না কান নিবা?" সে ভাবল কানের চাইতে মুখটাই ভাল। তাই সে মুখ নিতে

চাইল। ছোট বোনকে রেখে দিয়ে ছ'বোন বিদায় নিল। বার বছরে এক যুগ। বার বছর পূর্ণ হলে আবার ছ বোন এসে ছোট বোনকে নিয়ে গেল আর সেই সঙ্গে দালান বাড়ী ও কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। শুধু সেখানে পড়ে রইল তার পাতায় ছাওয়া এক ঘর। সে সময় রাখাল ঘুমের ঘোরে অচেতন ছিল। যাবার সময় তার বৌ পরী তাকে জাগাবার জন্য অনেক চেষ্টা করে ব্যর্থ হলে সে নিজের ঠিকানা ও পথের উল্লেখ করে চিঠি লিখে বালিশের নিচে রেখে দিয়ে গেল। রাখাল ঘুম থেকে উঠে দেখল সব ফাঁকা। কোথায় গেল দালান বাড়ী আর কোথায় বা গেল তার বৌ কে জানে? মনের অবস্থা গেল তাঁর বিগড়ে। হঠাৎ বালিশের নিচে চিঠিখানাতে তার নজর পড়ল। সে এক মুহূর্তও আর বিলম্ব করল না। বাতাসের সাহায্যে উড়তে উড়তে সে হাজির হল পরীর দেশে। শহর বাজার ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ সাতবোন পরীর সঙ্গে তার দেখা হল। সে নিজের বৌকে চিনতে পেরে তার হাত ধরে দেশে আনার চেষ্টা করল। কিন্তু একবার যে পরীর দেশে পা দিয়েছে সে জীবনে ফিরে যায় না। দেউ পরীর রাজা মানুষের গন্ধ পেয়ে সাত বোন পরীকে জিজ্ঞেস করল, "দেউ পুরীতে প্রবেশ করা তো মানু-ষের পক্ষে অসম্ভব। তবুও এখানে মানুষের গন্ধ কেন?" সাত বোন পরী রাজাকে আগেকার সব ঘটনা খুলে বলতেই তিনি সেখানে তার স্ত্রীকে নিয়ে থাকার অনুমতি দিলেন। সেই থেকে রাখাল ও তার বৌ পরী সুখে শান্তিতে বসবাস করতে লাগল।

****

।। দুঃখু শিয়াল ও খেঁকশিয়াল ।।

(এ লোক কাহিনীটি মালদহ ও পশ্চিম দিনাজপুর জেলার শেরশাহবাদ সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমান সমাজে প্রচলিত। শিয়ালকে সবাই চালাক পশু হিসাবে জানে কিন্তু এ কাহিনীতে শিয়াল খেঁক শিয়ালের কাছে বারে বারে ঠকে ও চেতন হয় নি। বরং খেঁকশিয়ালকে জব্দ করার জন্য শিয়ালের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।)

শিয়াল ও খেঁকশিয়াল দুজনের মধ্যে খুব বন্ধুত্ব। দুখু বহু দিন থেকে ইচ্ছা করেছে তারা ক্ষীর রান্না করে খাবে। কিন্তু মুখে মুখে

বললেই তো হয়ে যায় না তার জন্য চাল, দুধ আর গুড়ের প্রয়োজন। গ্রামের পাশে এক জঙ্গল। সেখানে দুবন্ধু মিলে বাস করে। তারা সুযোগের অপেক্ষা করতে লাগল। একদিন রাস্তা দিয়ে গোয়ালা দুধের ভাঁড় নিয়ে যাচ্ছে। খেঁকশিয়াল বন্ধুকে বলল, "দেখ, আমি গোয়ালার সামনে গিয়ে তাকে বিরক্ত করব, সে সহ্য না করতে পেরে যেই দুধের ভাঁড় রেখে আমাকে মারতে উঠবে ঠিক সেই সময় তুমি দুধের ভাঁড় নিয়ে একেবারে দৌড়ে চলে যাবে জঙ্গলের ভিতর।" সত্যি সত্যি ঐভাবে কাজ করতে গিয়ে তারা খুব সহজে দুধ যোগাড় করে ফেলল। একই উপায়ে তারা চাল ও গুড় সংগ্রহ করল। এখন সমস্যা দেখা দিল আগুনের। আগুন না হলে রান্না হবে কিসে? মাঠের এক কৃষক জমি চাষ করছিল। তার কাছে ছিল কল্কি। বুদ্ধি খাটিয়ে তারা ওটাও হাত করল। সময় মত রান্না চাপিয়ে ক্ষীর তৈরীও হয়ে গেল। এবার খাবার পালা।

অনেক দিনের পরিশ্রম ও চেষ্টায় দুবন্ধু ক্ষীরের মত একটা প্রিয় খাদ্য পেয়েছে। খেঁকশিয়াল শিয়ালকে বলল, "বন্ধু সব প্রস্তুত। এবার পদ্মাতে স্নান করে এসে শুরু করতে হবে।" তখন দুজনে চলল পদ্মায় স্নান করতে। পদ্মার ধারে একটা গরু মরে পড়েছিল। শিয়ালের হল লোভ। সে মাংস খাওয়ার জন্য সেখানে থেকে গেল। খেঁকশিয়াল আগে আগে এসে সব ক্ষীর খেয়ে ফেলল। অনেকক্ষণ পর শিয়ালের হুঁশ হয়েছে। সে ছুটে গিয়ে দেখল হাঁড়ি ফাঁকা। ভাবল এটা খেঁকশিয়ালের কাজ। রাগে প্রতিশোধ নেবার জন্য তার খোঁজে বের হয়ে পড়ল। চলে যায় সে মাঠ ঘাট জঙ্গল পার হয়ে। কিন্তু কোথাও খেঁকশিয়ালকে আর পায় না। শেষে তাকে পেল কচুর বনে। খেঁকশিয়াল বলল, "বন্ধু আমি রাজার কুশোর দেখাশুনা করি।" সে বলল, "দুটা কুশোর দাও না বন্ধু খাই।" খেঁকশিয়াল জবাব দিল, "তুমি এখানে বস, আমি রাজাকে জিজ্ঞেস করি আসি।" শিয়াল দেখল সুযোগ তো এই সুযোগে। সে কচুকে কুশোর ভেবে পেট ভরে খেয়ে নিল। কচু মুখে ধরতে শুরু করেছে। শিয়াল তো আর সহ্য করতে পারে না। ভাবল খেঁকশিয়ালকে পেলেই এবার মেরে শেষ করব। খুঁজতে খুঁজতে তাকে গিয়ে পেল মরিচের বনে। খেঁকশিয়াল বলল, বন্ধু আমি রাজার কলা দেখাশুনা করি।" কলা কেনা খেতে ভালবাসে? শিয়াল বলল, "বন্ধু আমি কলা খাব।" খেঁক শিয়াল জবাব দিল, একটু অপেক্ষা কর আগে রাজাকে জিজ্ঞেস করে আসি। এই সুযোগে সে মরিচকে কলা ভেবে বেশ খানিকটা খেয়ে গেল। এবার ঝালের ঠেলায় শিয়াল x তো অস্থির। এদিকে খেঁকশিয়াল ভয়ে একটা ইঁদারার পাশে লুকিয়ে রইল।

সে শিয়ালকে চোখ মুখ লাল করে আসতে দেখে ভাবল, এবার আর রক্ষা নেই। তবুও বুদ্ধি খাটিয়ে সে বলল, "এস বন্ধু তোমার জন্য রাজবাড়ীর সোনার পালঙ্ক বিছানো রয়েছে, একবার ঘুমিয়ে দেখ কত আরামের?" শিয়াল বলল, "দেখাও তো দেখি কেমন সোনার পালঙ্ক?" ইঁদারার ভিতরে ছিল মাকড়সার জাল। খেঁকশিয়াল ওটাকে দেখিয়ে বলল, "এটাই রাজার সোনার পালঙ্ক।" শিয়াল পালঙ্কে ঘুমাবার জন্য উপর থেকে যেই ঝাঁপ দিল অমনি মাকড়সার জাল ছেড়ে একেবারে পড়ল সে জলে। সেখানে না খেতে পেয়ে দু চার দিনে শিয়ালকে প্রাণ হারাতে হল।

****

।। রাজকন্যা ও কাক চরিত্র ।।

এ লোক কাহিনীটি মালদহের হরিশ্চন্দ্রপুর ও খরবা এলাকার বাঙ্গাল মুসলমান সমাজে প্রচলিত। সমাজের লোক বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে অনেক কাহিনী রচিত। রাজকন্যা কাক-চরিত্র বিদ্যা জানলেও তার স্বামী কৃষকের ছেলে ঐ সম্পর্কে একেবারে অনভিজ্ঞ ছিল। অনভিজ্ঞ ও মূর্খের কাছে বিদ্যার মূল্য কিছুই থাকতে পারে না। তাই এরূপ ভাগ্যবতীকে চিরদিনের মত বিদায় করতে স্বামীর হৃদয় বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় নি।)

কোন এক গ্রামে এক কৃষক বাস করত। তার একটি মাত্র ছেলে। তার নাম পাঁচু। ভাগ্যক্রমে রাজকন্যার সঙ্গে পাঁচুর বিয়ে হয়। রাজকন্যার কাক চরিত্র জানা ছিল। সে স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতালের অনেক বিষয় সম্পর্কে জানতে পেত জীবজন্তু ও পশুপক্ষীর মাধ্যমে। কারন সে জীবজন্তু ও পশুপাখীর কথা বুঝতে পারত। একদিন রাত্রে শিয়াল ডেকে উঠল। সে (শিয়াল) বলল, নদীর ধারে এক মেয়ের মৃত দেহ পড়ে আছে। তার দেহে রয়েছে নানা ধরনের অলঙ্কার, গয়নাগাটি, গলায় মূল্যবান সাতনরি হার আর কানে দুল। রাজকন্যা রাতের অন্ধকারে চুপি চুপি বিছানা থেকে উঠে সেই সব জিনিষ বাড়ীতে এনে লুকিয়ে রাখল। বিছানা থেকে উঠে বের হওয়ার সময় তার স্বামী টের পায়। সে ভাবল, আমার স্ত্রী মরা খায়। রাতের বেলা কোন কথা বলল না। সকালে পাঁচু বাবাকে ডেকে বলল, "এরকম বৌ ঘরে রাখা ঠিক নয়। আপনি এখুনি তাকে তার বাপ-মায়ের বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে আসুন।

পাঁচুর বাবা খুব সহজ সরল লোক। ছেলের মতি গতি লক্ষ্য করে বৌকে

নিয়ে পথ ধরলেন। পথে একটা নিম গাছের তলায় বিশ্রামের জন্য বসলেন। সেই XXX গাছের ডালে বসে ছিল এক কাক। সে কা-কা করে ডেকে বলল, "এই নিমগাছের গোড়ায় সাত ঘড়া টাকা আর অনেক খাবার জিনিস আছে। রাজকন্যা ছাড়া এ কথা আর কে বুঝবে? সে শ্বশুরকে কাকের সব কথা খুলে বলল। প্রথম প্রথম তিনি বিশ্বাস করতে চাইলেন না। তারপর আরম্ভ করলেন মাটি খুঁড়তে। অল্পক্ষনের মধ্যে সাত ঘড়া টাকা আর বিভিন্ন ধরনের খাবার পাওয়া গেল। তিনি মনে করলেন ঘরে এ বৌ থাকলে আমাদের অবস্থার অনেক উন্নতি হবে। তিনি বৌকে নিয়ে আবার বাড়ী ফিরে এলেন। পাঁচু ঘরের দরজায় বসে ছিল। সে দেখল রাক্ষসী আবার ঘরে ঢুকছে। রাগে সে একটা লম্বা লাঠি হাতে নিয়ে জোরে বসিয়ে দিল বৌয়ের মাথায়। রাজকন্যা গেল মারা। বাবার মুখে পাঁচু পথের ঘটনা শুনে বৌয়ের জন্য অনেক আফসোস ও দুঃখ করল। কিন্তু আফসোস করেও কোন ফল হল না। কাক চরিত্রের XXX অবসান হল।

****

।। ছয় রানীর হিংসা ।।

(এ লোককাহিনীটি মালদহ ও পশ্চিম দিনাজপুর জেলার শেরশাহবাদ সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমান সমাজে প্রচলিত। ছোট রানীর প্রতি অন্যান্য রানীদের হিংসা সব অঞ্চলের কাহিনীতে বর্তমান। হিংসা করলে কি হবে। সেই হিংসা আবার তাকেই জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে। এ কাহিনীতে একেবারে শেষের দিকে রাজা রানীদের হিংসা ও ষড়যন্ত্রের বিষয় টের পেয়েছেন।। তিনি উদ্ধার করেছেন ছোট রানীকে আর ছেলে মেয়েদের। শেষে ছয় রানীকে জীবন্ত কবর দিয়ে বিদায় করেছেন চিরদিনের মত।)

এক রাজার সাত রানী। রাজার বড় দুঃখ। কারন রানীর ছেলে পেলে হয় না। একদিন এক সাধু এসে রাজদরবারে হাজির। রাজা তাঁকে নিজের দুঃখের কথা শুনালেন। সাধু বললেন, আপনি বড় রানীকে পাঠিয়ে দিবেন আমগাছ তলায়। এক ঢিলে ডাল পাতা ফল যাই পড়ুক, তা বেঁটে সব রানীকে খাওয়াতে হবে। তা হলে খোদা চাহে ছেলের মুখ দেখতে পারবেন। রাজা সাধুর কথামত কাজ করলেন। বড় রানী ফল বেঁটে ছয় রানী মিলে খেলেন। ছোট রানী সেই সময় নদীর ঘাটে স্নান করতে গিয়েছিল। ছোট রানীকে রাজা বেশী আদর করতেন। তাই ছোট রানীর প্রতি ছ রানীর হিংসা হওয়া স্বাভাবিক। ছোট রানী বাড়ী এসে তাদের মুখ

ধরতে দেখল। সে বলল, "বুবু তোমরা কি খাচ্ছো ?" ছ'রানী জবাব দিল শিল নোড়া ধুয়ে তুমিও খেয়ে নাও। ছোট রানী তাই খেলো। ছ রানী ভেবেছিল ছোট রানীর ছেলে না হলে তার প্রতি রাজার আদর অনেকটা কমে যাবে। কিন্তু হল তার উল্টোটা। একমাত্র ছোট রানীই হলেন গর্ভবতী। রাজার ও খুব আনন্দ। তিনি ভাবলেন যাইহোক আর কিছু দিন পর ছেলের মুখ দেখতে পাওয়া যাবে। একমাস পর রানীর প্রসব বেদনা শুরু হল। ছরানী নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে তাকে বলল, "ছেলে হতে আর দেরী নেই তুমি কুঠির মুখের ভিতর তোমার মাথাটা ভরে দাও।" ছোট রানী ভাবলেন, "এটাই বুঝি নিয়ম।" তিনি তাই করলেন। রানীর সুন্দর দেখে ছেলে হল বটে কিন্তু ছ রানীতে চালাকি করে ছেলেটাকে একটা মাটির হাড়িতে ভরে মুখ বন্ধ করে ভাসিয়ে দিল নদীর জলে। অন্য একটা হাড়িতে ইট ভরে রানীকে বলল, "এই তোমার ছেলে।" রাজাকে ডেকে ছরানী শুনাতে লাগল, "ইট বিয়ানী, ইঁট বিয়ানী, ইঁট বিয়ালিছে।" ছোট রানী ইঁট প্রসব করেছে দেখে রাজা রাগ করে তাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলেন।

এদিকে নদীর জলে হাঁড়ি ভাসতে ভাসতে এসে লাগল একটা ফুল বাগানের ধারে। ঐ ফুলবাগানে একটা ছোট ঘর বেঁধে থাকত মালিনী। বার বছর ধরে বাগানে কোন ফুল ফুটে নি। তাই সে অতি দুঃখে দিন কাটাত। একদিন মালিনী গেল নদীর ঘাটে জল আনতে। সে হাঁড়িটা তুলে ঢাকনি খুলতেই ছেলে বের হয়ে এল। তাকে ফুল বাগানে আনতেই ধীরে ধীরে সব ফুল গাছে ফুল ফুটল। সবাই মালিনীকে বলতে লাগল, "হে মালিনী, হে মালিনী তোর বাগানে ফুল ফুটেছে গোলাপ চাঁপা, বেলী।" দীর্ঘদিন পর রাজা ছ'রানীর সকল ষড়যন্ত্র ও শয়তানীর বিষয় অবগত হলেন। এবার তিনি চললেন ছোট রানী ও ছেলের খোঁজে। অনেক খোঁজাখুঁজির পর তিনি ছোটরানী ও ছেলেকে বাড়ী নিয়ে এলেন। তারপর তিনি হিংসুটে ছ'রানীকে মাটি খুঁড়ে কবর দিয়ে তাদের চিরদিনের মতো বিদায় দিলেন।

****

।। রাজার ছেলে চোর ।।

(এলোক কাহিনীটি মালদহের দূরবর্তী মুসলমান সমাজে প্রচলিত। রাজার তিন ছেলের মধ্যে ছোট ছেলে চুরি করার কাজকে বেশী পছন্দ করেছে। চুরি করতে গিয়ে

চোরকে অনেক বিদ্যা, বুদ্ধি ও কৌশল অবলম্বন করতে হয়। রাজার কথা মত সব জিনিস সে চাঁচল রাজবাড়ী থেকে চুরি করে নিয়ে এল। আগে ভাগে চাঁচল রাজাকে সতর্ক করে দেওয়া সত্ত্বেও তার ছোট ছেলে যে চুরি করতে পারবে এ ধারনা বা বিশ্বাস রাজার ছিল না।)

এক রাজার তিন ছেলে। রাজা খুব বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন। তিনি আর বেশী দিন বাঁচবেন না মনে করে সিপাহীকে বললেন, "আমার ছেলেদের এখানে ডেকে নিয়ে এস।" প্রথমে এল বড় ছেলে। রাজা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আমার মরার পর তুমি সংসারে কি কাজ করে খাবে?" ছেলে জবাব দিল, "আপনি যেভাবে সংসার চালিয়েছেন আমিও ঠিক সেইভাবে কাজ করে খাব।" মেজো ছেলেও একই জবাব দিল। শেষে এসে হাজির হল তাঁর ছোট ছেলে। সে বলল। বাবা, সংসারে গৃহস্থালির কাজটা বড় কঠিন। কাপড়ে যেভাবে তালি দেওয়া হয়, একাজও খানিকটা ঐরূপ। তার চাইতে চুরি করার কাজ অনেক ভাল। আমি চুরি করেই সংসার চালাব। রাজা দেখলেন মহা বিপদ। আমার ছেলে হবে কিনা চোর। তিনি তাকে বললেন, "চুরি করার কাজটা যে সবচেয়ে ভাল তার প্রমান দেখাতে হবে। সাত দিনের মধ্যে চাঁচলের রাজার বাড়ী থেকে দুল দুল ঘোড়া, বিজুলি তলোয়ার আর রানীকে চুরি করে এনে দিতে হবে।"

সেই দিনই রাজা চাঁচলের রাজাকে চিঠি দিয়ে সাবধান করে দিলেন। তিনি লিখলেন, "সাত দিনের মধ্যে এক অল্প বয়সের ছেলে আপনার বাড়ী থেকে দুল দুল ঘোড়া, বিজুলি তলোয়ার ও রানীকে চুরি করবে।" তিনি ভাবলেন এত সাবধানের মধ্যে তাঁর ছেলে কিছুতেই চুরি করতে পারবে না। তখন বাধ্য হয়ে সে চুরির কাজ ছেড়ে দেবে। রাজার ছেলে এক সাধুর বেশে একদিন সন্ধ্যায় চাঁচল রাজ দরবারে হাজির হল। সে গাঁজার কল্কিতে দম দিয়ে সিপাহীকে বলল, "আজ এখানে একটা ছেলে আসবে চুরি করতে।" ঐ সময় বাড়ীর ভিতর থেকে রাজা এলেন। তিনি গাঁজা খোর সাধুকে দেখে বললেন, তুমি এখানে কেন? সে জবাব দিল, "হাট থেকে ফিরতি পথে রাত হয়ে যাওয়ায় এখানে আশ্রয় নিয়েছি।" রাজা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "আর কাউকে দেখেছ?" সে বলল, "একজন মদখোরকে ঐদিকে যেতে দেখেছি একটু পরে হয়তো আবার আসতে পারে। রাজা বললেন, "তাকে ধরে দিতে হবে।" সে বলল, "হুজুর তার গায়ে খুব শক্তি। তাকে ধরে রাখার ক্ষমতা আমার নেই। তার চেয়ে আপনি বরং এক কাজ করুন। পোষাক বদল করে আপনি এইখানে দাঁড়িয়ে থাকুন। আর আপনার পোষাক পরে

আমিও লুকিয়ে থাকি।" রাজা তাই করলেন। এদিকে ছদ্মবেশী রাজার ছেলে রাজার পোষাক পরে অন্তঃপুরে প্রবেশ করল। তারপর সে দুটা দুল ঘোড়া, পিস্তল তলোয়ার নিয়ে রানীকে বলল, "ডাকাত এসেছে, এক্ষুনি ঘোড়ার পিঠে উঠ।" যেই ঘোড়ার পিঠে উঠা অমনি ঘোড়া ছুটিয়ে দে দৌড়। এইভাবে সে রাজা ও রানীর চোখে ফাঁকি দিয়ে সহজে চুরি করে বাবার কাছে হাজির। রাজা অবাক হয়ে ছেলের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

****

।। চান ও সুরুয দু ভাই ।।

(এ লোককাহিনী মালদহের দ্বারবঙ্গীয় মুসলমান সমাজে প্রচলিত থাকলেও অন্যান্য খোট্টা ভাষাভাষী হিন্দু সমাজে ঠিক এই ধরনের কাহিনী বর্তমান। চান সুরুয দু ভাইয়ের মধ্যে সুরুয সাধুর হাতে পড়ে মৃত্যুকে ডেকে নিয়েছে। কিন্তু অন্যত্র যে সে রক্ষা পেলেও চক্ বুড়ী তাকে মেরে ফেলেছে। ছোট ভাই চান তাকে জীবদান দিল বটে কিন্তু ভুলক্রমে সে সুরুযের হাতে মারা পড়ল। মানুষের জীবনের উত্থান-পতন, ভাগ্যবিপর্যয় ইত্যাদি বিষয় এ কাহিনীতে কিছু কিছু নিহিত রয়েছে।)

রাজার এক রানী। তার কোন ছেলে পেলে হয় না। একদিন এক সাধু এসে রাজাকে বলল, "সাতটি আমের থোকা বাম হাত দিয়ে পেড়ে ডান হাতে ধরতে হবে, যেন মাটিতে না পড়ে। সেই আমগুলো রানীকে খাইয়ে দিলে খোদা চাহে ছেলে হবে। তবে দুটো ছেলে হলে একটা থাকবে আমার।" রাজা সম্মত হলেন। সাধুর কথামত কাজ করতে গিয়ে শীঘ্রই তাঁর দু ছেলে হল। দুজনের নাম চান ও সুরুয। সুরুয বড়, চান ছোট। বার বছর পর একদিন ঐ সাধু ফিরে এসে রাজার কাছে একটা ছেলে চাইল। রাজা আগে থেকে অন্য দুটো ছেলে কিনে এনেছিলেন। তার মধ্যে একটা দিলেন সাধুকে। আর নিজের ছেলে চান-সুরুযকে ঘরের ভিতর লুকিয়ে রেখেছিলেন। সেই সময় দু ভাই ঘরে বসে পিষ্টি খাচ্ছিল। পিঠে গুলো খাবারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ মুখ করে দরজার ফাঁক দিয়ে বের হয়ে আসছিল। সাধু রাজার চালাকি বুঝতে পেরে ছেলে না নিয়েই বেরিয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ পর রাজা দরজা খুলে দিলে দু ভাই বাইরে গেল খেলতে। সাধু ছিল লুকিয়ে। সে সুরুযকে ধরে নিয়ে চলল নিজের সাথে। ভাই চান কেঁদে কেঁদে বলল, "দাদা তুমি তোমার ঠিকানা দিয়ে যাও।" যাবার সময় সুরুয ভাইকে একটা তুলসীর গাছ

ও দাই দিয়ে বলল, "আমি মরে গেলে এই তুলসীর গাছ শুকিয়ে যাবে, আর দাই খুন হবে।"

সাধুর সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে সুরুষ এক জঙ্গলে গিয়ে হাজির। ঐ খানে এক গাছের তলায় দুজনে থাকে। সাধু রোজ সুরুষকে ঘুঁটে কুড়াতে পাঠায়। তাকে বলল, "তুমি চারটা দিকের মধ্যে তিন দিকে ইচ্ছামতো ঘুরে বেড়াবে কিন্তু খবরদার। দক্ষিন দিকে যেও না।" সুরুষের ছেলে বুদ্ধি সে একদিন দক্ষিন দিকেই চলল। পথ চলতে চলতে সে অনেক দূরে একটা ইঁদারা পেল। সেখানে ঐ সাধু মানুষের মুণ্ড কেটে কেটে ইঁদারাতে ফেলেছিল। কাটামুণ্ড গুলো ছেলেকে দেখে হেসে উঠে বলল, "বাছা,, তোমাকেও এখানে আসতে হবে।" সে বলল, "তবে বাঁচার কি কোন উপায় নেই?" তারা জবাব দিল, "একটা উপায় আছে। সাধু এখানে এসে তোমাকে প্রনাম করতে বলবে। তুমি বলিও আমি জানি না, তোমাকে শিখিয়ে দাও। সাধু মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে যেই তোমাকে দেখাতে যাবে অমনি গাছের খাঁড়া হাতে নিয়ে তার গর্দানে বসিয়ে দিও।" কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সত্যি সত্যি ঐ সাধু এসে পৌঁছাল। কাটা মুণ্ডগুলোর নির্দেশমতো কাজ করে সে সাধুর মুণ্ড কেটে ফেলল। তারপর নিজের হাতের কনিষ্ঠ আঙুল কেটে ইঁদারার ভিতর রক্ত ফেলতেই সব কাটামুণ্ডগুলো মানুষ হয়ে বেরিয়ে নিজেদের বাড়ী ফিরে গেল। সুরুষও নিজের বাড়ীর পথ ধরল। অন্য এক দেশের রাজবাড়ীর পাশ দিয়ে সে হেঁটে যাচ্ছিল। রাজার একটি মাত্র মেয়ে। তার বিয়ে হয় না। রাজকন্যা দোতলার ছাদ থেকে সুরুষকে দেখতে পেয়ে সিপাহীকে পাঠিয়ে, তাকে ডেকে আনল। রাজকন্যার সঙ্গে সুরুষের হল বিয়ে। সকালে সুরুষ গেল শিকার করতে। জঙ্গলে গাছের তলায় এক উদ্‌বুড়ী সোনা, চাঁদির গুটি নিয়ে বসেছিল। সে সুরুষকে বলল, "চল দুজনে ডাল পাতা, ডাল পাতা খেলি।" গাছে উঠে সুরুষ ডাল পাতা খেলছে আর হঠাৎ আচমকা বুড়ী তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল গাছের নীচে একেবারে মাটিতে। সুরুষ মারা গেল। এদিকে চানের তুলসী গাছ গেল শুকিয়ে আর দাইও হল খুন। চান বুঝল, তার দাদা সুরুষ মারা গেছে। সে বেরিয়ে গেল দাদার খোঁজে। হাঁটতে হাঁটতে সে হাজির হল তার বৌদি রাজকন্যার কাছে। দু ভাই দেখতে একই রকম ছিল। রাজকন্যা ভাবল, এটাই আমার স্বামী। চান রাতের বেলায় সোনার পালঙ্কে রাজকন্যার সঙ্গে ঘুমাল বটে তবে মাঝখানে তলোয়ার রেখে দিল। সকাল বেলা খেলতে খেলতে ঐ উদ্‌বুড়ীর খানে গিয়ে হাজির। বুড়ীটা আগের মত গাছের তলায় সোনা চাঁদির গুটি নিয়ে বসেছিল। চান সেখানে তার মরা ভাইকে দেখতে পেল। বুড়ী চানকে বলল, "চল দুজনে ডালপাতা ডালপাতা

খেলি । চান ভাবল," দাদাকে এই বুড়ীই মেরে ফেলেছে ।" তাই সে সতর্ক হয়ে জলপাতা খেলছিল । সুযোগ বুঝে চান বুড়ীকে ধাক্কা মেরে দিল ফেলে । ঐ বুড়ী মরে গেল । চান গাছ থেকে নেমে নিজের বাম হাতের কনিষ্ঠ আঙুল কেটে দাদার উপর অল্প একটু রক্ত ছিটতেই সুরুয জীবিত হয়ে উঠল । সুরুয বলল, কে আমার কাঁচা ঘুমে উঠিয়ে দিলে ?" পাশে ছিল চানের তলোয়ার । সে হাতে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে চানকে দুটুকরো করে ফেলল । তারপর ভাইকে চিনতে পেরে সুরুয অনেক কান্নাকাটি করল । কিন্তু আর তাকে ফিরে পেল না ।

****

॥ এক রসিক ও রাজকন্যা ॥

[illegible]

(এলোক কাহিনীটি মালদহের হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকাধীন বাঁটাল মুসলমান সমাজভুক্ত মাত্রাই ডাহিগ্রামের মোঃ দিদারের নিকট থেকে সংগৃহীত । রসিক তার কথার মাধ্যমে লোককে শুধু হাসায় না সে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার মূল্য দিতে জানে । তাই সে গ্রামের বুড়ার কাছ থেকে তিনটাকার বিনিময়ে তিনটি উপদেশ পেয়েছে । উপদেশগুলোকে কাজে লাগিয়ে সে লাভ করেছে রাজকন্যাকে আর যৌতুকের পাঁচশ বিঘা জমি ।)

কোন এক গ্রামে একজন রসিক ছিল । সে একদিন অন্যগ্রামের এক বৃদ্ধের বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে তিন টাকায় তিনটি উপদেশ পায় । উপদেশগুলো নিম্নরূপ :-

(১) কোনখানে যদি কিছু খাও তাহলে কাউকে খাইয়ে তারপর খাবে ।

(২) যদি পরের বাড়িতে কোনদিন রাত্রে থাক, তাহলে প্রথমে বিছানা ছেড়ে তবে ঘুমাবে ।

(৩) বেগার দিবে কিন্তু কারো বিগড় বা ক্ষতি করবে না ।

বৃদ্ধ রসিককে বলল, "উপদেশগুলো খুব মূল্যবান ।" ঐ দেশের রাজার মেয়ে প্রতিজ্ঞা করেছে, "যে আমার দুটি প্রশ্নের জবাব দিতে পারবে কিংবা এক রাত আমার ঘরে ঘুমিয়ে থাকবে, তাকে আমি স্বেচ্ছায় বিয়ে করব ।" রাজকন্যা তো চাঁদের মতো রূপসী । তাকে কে না চাইবে বিয়ে করতে । কিন্তু অনেক রাজপুত্র, জমিদার পুত্র এল কিন্তু কেউ রাজকন্যাকে বিয়ে করতে পারল না । রসিক ভাবল,

"একবার চেষ্টা করে দেখি।" সে একদিন সন্ধ্যায় রাজবাড়ীতে গিয়ে হাজির হল। রাজ-বাড়ীর দেউড়ীতে ঘণ্টা টাঙানো ছিল। সেটা বাজাতেই দরজা খুলে রাজকন্যা বেরিয়ে এল। একটা সামান্য রসিকের সখ দেখে রাজকন্যা হেসে উঠল। সে বলল, "হে রসিক তুমি কোন সখে মরতে এসেছ?" রসিক জবাব দিল, "আমি মরতে রাজী আছি।" রাজকন্যা আর কি করে তাকে ডেকে নিয়ে গেল ঘরের ভিতর। সে তাকে খাবারে বিষ মিশিয়ে খেতে দিল। রসিক দেখল তার থালার চার পাশে বিড়াল ঘুরে বেড়াচ্ছে। অমনি বুড়ার প্রথম উপদেশটির কথা তার মনে পড়ে গেল। সে খাবার আগে বিড়ালকে এক মুঠো খাবার দিতেই ছটফট করতে করতে মারা পড়ল। রসিক আর খাবার খেল না। প্রথম দফায় সে এইভাবে রক্ষা পেল।

তার পর রাজকন্যা নিজ হাতে বিছানা করে দিল ঘুমাবার জন্য। বালিশের পাশে লুকিয়ে রাখল খোলা তরবারী। রসিক ঘুমাতে যাবে এমন সময় বুড়ার দ্বিতীয় উপদেশটার কথা মনে পড়ল। সে বিছানা ঝাড়তেই খোলা তরবারী দেখল। তরবারী বন্ধ করে বালিশের নীচে রেখে ঘুমিয়ে রাত কাটাল। দ্বিতীয় যাত্রায়ও সে বেঁচে গেল। সকালে রাজকন্যার সঙ্গে রসিকের বিয়ে হল। তার সঙ্গে সে অর্দ্ধেক রাজত্ব ও দান পেল। রসিক এবার তৃতীয় উপদেশের সত্যতা যাচাই করতে চাইল। সে বৌকে বলল, "আমার সঙ্গে একটা শপথ করতে হবে।" রাজকন্যা রাজী হল তবে সে শপথটা কি তা জানতে চাইল। রসিক তাকে জানাল, "আমি এখন মাঠে কাজ করতে চললাম। তোমাকে খাবার পৌঁছে দিতে হবে।" মাঠে মোড়ল অনেকগুলো পাইট নিয়ে ধান নিড়াচ্ছিল। রসিক মোড়লকে বলল, "আমিও নিড়াবার কাজ করব।" তিনি তাকে পাইট হিসাবে রেখে নিলেন। মোড়লের বাড়ী থেকে খাবার এলে সবাই মিলে খাওয়া দাওয়া করল কিন্তু রসিক খেল না। মোড়ল জিজ্ঞাসা করল, "তুমি খাবে না কেন?" সে জবাব দিল, "আমার খাবার স্বয়ং রাজকন্যা নিয়ে আসবে।" মোড়ল শুদ্ধ সবাই হেসে একাকার। রাজকন্যা কোন দুঃখে একটা গরীব ক্ষেত মজুরের খাবার নিয়ে মাঠে আসবে? তারা বলল, "এ অসম্ভব কথা।" মোড়ল চ্যালেঞ্জ স্বরূপ নিজের পাঁচশ বিঘা জমি দেওয়ার কথা ঘোষনা করলেন। আধঘণ্টা পরে পাল্কীতে চড়ে রাজকন্যা স্বামীর খাবার নিয়ে এল মাঠে। সবাই তো একেবারে অবাক। মোড়ল নিজের পাঁচশ বিঘা জমি রসিকের নামে লিখে দিলেন।

****

।। [illegible] ।।

।। ভাগ্যবান গরীব ।।

(এ লোক কাহিনীটি মালদহ ও পশ্চিম দিনাজপুরের বঙ্গাল মুসলমান সমাজে প্রচলিত। গরীব লোকটি সৎ ও বিশ্বাসী ছিল। সে অল্পতেই সন্তুষ্ট থেকে অন্যের বাড়ীতে কাজ করেছে। সামান্য আট গণ্ডার ডালিম ফলের পরিবর্তে রাজার কাছে সে পেয়েছে মহা মূল্যবান হীরার দানা ভর্তি ডালিম। তার ভাগ্যের হয়েছে পরিবর্তন। একদিন সে বিরাট ধনী হয়ে উঠল। ভাগ্যকে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায় বিশ্বাস করে। আর এ ধর্মীয় বিশ্বাসকে কেন্দ্র করেই অনেক লোক-কাহিনীর সৃষ্টি হয়েছে আমাদের দেশে।)

একজন গরীব ক্ষেত মজুরের এক স্ত্রী দু ছেলে। দিনে খেটে খুটে যা পায় তাতে তার সংসারে তিন বেলা জুটে না। একদিন তার স্ত্রী তাকে বলল, "তুমি বিদেশ গেলে বেশী টাকা রোজগার করে ঘরে আনতে পারবে।" স্বামী স্ত্রীকে বলল, "আমি বিদেশ যাব ঠিক কিন্তু তোমাকে ঘর থেকে বের হতে হবে না। কারন তুমি বাইরে গেলে তোমার রূপ দেখে গুণ্ডারা বিপদ ঘটাতে পারে।" স্ত্রী স্বামীর কথাতেই রাজী হয়ে গেল। স্বামী বিদেশে রওয়ানা হল। পথে এক মৌলভী সাহেবের একজন চাকরের প্রয়োজন। তিনি তাকে বললেন, "তুমি কি আমার বাড়ীতে কাজ করতে চাও?" লোকটি প্রশ্ন করল, "আপনার কয় বিঘা সম্পত্তি আছে আর সেগুলো কি উপায়ে করলেন?" মৌলভী সাহেব জবাব দিল, "জমির ফসল উঠিয়ে আমি গরীব দু:খীদের লাগান্ দিয়ে তার মাধ্যমে সুদ নিয়ে জমি বাড়িয়েছি।" গরীব লোকটি বলল, "তা হলে আমি থাকতে পারব না।" সেখান থেকে বিদায় নিয়ে সে এক অন্য দেশে পৌঁছাল। পথে এক রিক্সাওয়ালার সঙ্গে তার দেখা। সেও অনেকদিন থেকে একটা চাকরের খোঁজ করছে কিন্তু পায় না। তার নিজের কিছু জমি আছে। সব সম্পত্তি রিক্সা চালিয়ে তার পারিশ্রমিকের অর্থ দিয়ে কেনা। লোকটি রিক্সাওয়ালার বাড়ীতে কাজ করতে রাজী হল। বেতন ঠিক হল মাসিক চার গণ্ডা। দু মাস পর সে আট গণ্ডা পয়সা নিয়ে চলল বাড়ীর খরচা দিতে। তা না হলে স্ত্রী ছেলে পেলে যে অনাহারে মরবে।

বাড়ীর পথে ছিল এক হাট। সে ভাবল, কিছু চাল ডাল শাক্ সব্জী কিনে নিই। কিন্তু সামান্য আট গণ্ডা পয়সা দিয়ে তো আর ও গুলো জিনিষ কেনা যায় না। তাই সে হাটে ঘুরে ঘুরে সস্তা জিনিষ দেখতে লাগল। সন্ধ্যা হয়ে এল। সে একটা ডালিমের দোকানে গিয়ে সেই পয়সা দিয়ে আধ

সেরের একটা ডালিম কিনল। হাটে আর লোকজন খুব বেশী নেই। সে একজন পরিচিত ও বিশ্বাসী লোককে ডালিমটা দিয়ে বলল, "তুমি এটা আমার বাড়ীতে পৌঁছে দিও।" গরীব লোকটি আর বাড়ী না গিয়ে রিক্সাওয়ালার কাজে যোগ দিল। বিশ্বাসী লোকটি নিজের বাড়ী পৌঁছে যত্ন করে ডালিম ফলটা লুকিয়ে রেখে দিল। সে মনে করল, "পরের দিন এটা দিয়ে আসব।" ঐ দেশে এক বিরাট জমিদার ছিল। তাঁর একটিমাত্র মেয়ে। মেয়েটি কয়েকদিন থেকে পেটের বেদনায় ছটফট করছে। দেশ-বিদেশের ডাক্তার কবিরাজ, হাকিম ছুটে এল কিন্তু কিছুতেই ভাল হল না। এক বুড়া কবিরাজ বললেন, "ডালিম ফল খাওয়াতে পারলে এ রোগ সেরে যাবে।" লোকজন গিয়ে হাট-বাজার তন্ন তন্ন করে খুঁজল। কোথাও ডালিম ফল পাওয়া গেল না। শেষে জমিদার গোটা দেশে ঢোল সহরত করে জানিয়ে দিলেন, "যে একটা ডালিম ফল দিতে পারবে তাকে পাঁচশ টাকা বখশিস দেওয়া হবে। ডালিম ফল যার কাছে ছিল সে ভাবল, "আমি অন্যের ফল কি করে দিই?" সে জমিদারের কাছে গিয়ে বলল, "আমি ফল দিতে পারি তবে এর বদলে ঠিক একই ওজনের ডালিম আমাকে এনে দিতে হবে।" জমিদার তাতেই রাজী হয়ে গেলেন। তিনি মেয়েকে ফল খাওয়াতেই আরোগ্য হল। তারপর তিনি ডালিমের কথা একেবারে গেলেন ভুলে। ডালিমের খোসাটা আলমারিতে [redacted] রেখেছিলেন। লোকটি কিছুদিন পর জমিদার বাড়ীতে এসে ডালিম চাইল। জমিদার ডালিমের খোসাতে হীরার দানা ভরে ভাল মত মুখ বন্ধ করে দিলেন আর ওজনেও ঠিক আধ সের হল। ঐ ডালিমটা লোকটির হাতে দিয়ে তাকে বিদায় করলেন। লোকটা আর নিজের বাড়ী গেল না। সে ডালিম ফলটা দিয়ে এল ঐ গরীব ক্ষেতমজুরের স্ত্রীর হাতে।

সন্ধ্যার সময় বড় ছেলে ডালিম ফল খেতে চাইলে তার মা বলল, তোর ভাই ঘুমিয়ে গেছে সকালে দুজনকে ভাগ করে খেতে দিব। কিন্তু ছেলেটা মায়ের কথা শুনবে কেন? মা যখন বিছানায় ঘুমিয়ে পড়েছে তখন সে চুপি চুপি ডালিম ফল ভেঙে একটা দানা দাঁতে দিয়ে দেখল খুব শক্ত। সে ঘরে ফেলে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। সকালে তার মা ঘর পরিষ্কার করার সময় সবগুলোকে নিয়ে আবর্জনার স্তূপে ফেলে দিল। ঐ সময় সেই রাস্তা দিয়ে এক ব্যবসায়ী যাচ্ছিল তার নজর পড়ল ঐ আবর্জনার ভিতরকার হীরার উপর। ব্যবসায়ী আবর্জনা কিনে নিতে চাইল। কিন্তু গরীব ক্ষেতমজুরের স্ত্রী বলল, "আবর্জনার আবার দাম কি নিব। যার প্রয়োজন সে এমনিতেই নিয়ে যেতে পারে। ব্যবসায়ী বাড়ী গিয়ে দু বস্তা টাকা ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে এনে মেয়ের হাতে দিল। তারপর সে আবর্জনা বোঝাই করে নিয়ে গেল।

সেই টাকা দিয়ে গরীবের স্ত্রী অনেক জমি জায়গা বাড়ী কিনে বিরাট জমিদার হয়ে গেল। এদিকে আর একমাস খেটে গরীব লোকটি চারগণ্ডা পয়সা নিয়ে বাড়ীর রাস্তা ধরল। পথের লোকগুলো তাকে চিনতে পেরে বলল, "কেমন জমিদার সাহেব, ভাল আছেন তো?" সে ভাবল, "সবাই বুঝি আমাকে ঠাট্টা করছে।" বাড়ীতে ঢুকে দেখল সত্যি সত্যিই তার অবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে। কিন্তু কি করে এটা সম্ভব হল এর কারনটা সে বুঝে উঠতে পারল না। তবে অকারনে নিজের স্ত্রীর উপর সে সন্দেহ করে বসল। লোকটি মনে করল হয়তো তার স্ত্রী অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জন করে বিষয় সম্পত্তি ঘরবাড়ী কিনেছে। তারপর স্ত্রী ও ছেলের কাছে ডালিম ও আবর্জনা বিক্রির সম্পূর্ণ ঘটনা শুনে সে এর হদীশ নিয়ে দেখল জমিদার ডালিমের ভিতর হীরা ভর্তি করে তাকে ফেরৎ দিয়েছিল। এখন সে বুঝতে পারল। সৎ ও বিশ্বাসী লোকের অর্থ বিনষ্ট হয় না।

****

।। বুড়ির ছেলে ও শিয়াল ।।

(এ লোককাহিনীটি মালদহ জেলার শেরশাহবাদ সম্প্রদায় ভুক্ত রতুয়া এলাকাধীন বাবলাবনা দুর্গাপুর গ্রামের মোঃ আলাউদ্দিনের (পিতা সেখ মোসলিম) নিকট থেকে সংগৃহীত। বুড়ী ছেলের কথা বুঝতে না পেরে মুরগার বদলে পাড়া প্রতিবেশীর কাছ থেকে মোরগ এনে শিয়ালকে খেতে দিয়েছে। বুড়ীর ছেলে প্রথম দফায় শিয়ালের মাংসকে ছাগলের মাংস বলে বিক্রি করলেও চামড়া বিক্রি করতে গিয়ে সে ধরা পড়েছে এবং আচ্ছামত মারও খেয়েছে। আসলে চালাকি সব ক্ষেত্রে খাটে না। বুড়ীর ছেলের বেলায়ও তাই হয়েছে।)

কোন গ্রামে বুড়ীর এক ছেলে ছিল। সে খুব গরীব। তার বাবা নেই শুধু ঐ বুড়ী মা। এক শিয়াল এসে রোজ রোজ পাড়া-পড়শীর মোরগ খেয়ে পালিয়ে যায়। চাষা খায় ভুয়া, তার বুদ্ধি নাশা। বুড়ীর ছেলে শিয়ালটাকে ধরার চেষ্টা করল। সে রাতের বেলা লণ্ঠনের আলো কমিয়ে জঙ্গলে লুকিয়ে রইল। শিয়াল মোরগ ধরে জঙ্গলে এনে আনন্দে খেতে শুরু করল। এই সুযোগে বুড়ীর ছেলে খপ্ করে শিয়া-লের গলাটা ধরল। এখন শিয়ালটা আর পালায় কোথায়? তাকে বেঁধে নিয়ে এল মায়ের কাছে। সে ঘরের খুঁটিতে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখল। পরদিন সে যাবে বিদেশে মাটি কাটতে। মাকে বলল, "রোজ সন্ধ্যায় একে একটা করে 'মুরগা'

দিও।" মুরগুরা বলতে তার মা বুঝল মোরগের কথা। বুড়ী মা পাড়া পড়শীর কাছ থেকে রোজ একটা করে মোরগ চেয়ে নিয়ে এসে শিয়ালকে খেতে দেয়। "খেটে খুটে বিদেশ থেকে ছেলে ফিরে এলে মোরগের দাম বুঝিয়ে দেবে" এই বলে সবাইকে সে শান্ত করে রাখে।

মাসখানেক পর বুড়ীর ছেলে বাড়ী ফিরে এল। পাড়া-পড়শী ছুটে এল তার কাছে। সবাই বলল," আমাদের মোরগের দাম দাও।" সে তো একেবারে অবাক। মাকে বলেছে শিয়ালটাকে রোজ সন্ধ্যায় একটা করে মুগরা অর্থাৎ বাঁশের তৈরী মোটা লাঠির আঘাত করতে আর কিনা তার মা পাড়া - পড়শীর কাছ থেকে রোজ একটা করে মোরগ এনে দিয়েছে। রাত্রে বিছানায় শুয়ে শুয়ে সে বুদ্ধি খাটাতে লাগল। তার কাছে একটি পয়সাও নেই। কোন রকমে সে একটা উপায় খুঁজে বের করল। ভোরের সময় সে শিয়ালটাকে জবাই করে চামড়াকে লুকিয়ে রাখল। সকালে পাড়া-পড়শীকে ডেকে বলল" গতকাল চাউল খেয়ে আমার বাড়ীর ছাগলের পেট ফুলে যায় তাই জবাই করে দিয়েছি। এখন দরকার হলে মাংস নিয়ে যাও। খুব তাজা মাংস।" বুড়ীর ছেলে মাংসের দর কিছু কম করাতে সবাই কিনে নিয়ে মজা করে শিয়ালের মাংস খেল। আর কোন রকমে মোরগের দামটাও পরিশোধ হল। এবার ভাবল" মথুরাপুর হাটে শিয়ালের চামড়া বিক্রি করে আসি।" হাটে গিয়ে বুড়ীর ছেলে ক্রেতাদের বলল," আমার বাড়ীর তাজা ছাগলের চামড়া। দর কিছু কম করে দিব।" শিয়ালের চামড়া কে না চেনে। সবাই মিলে তাকে আপ্যায়ন দিল আইলের ইঁড়া, লাঠির গুঁতো। আর কানমলা খেয়ে শেষে বুড়ীর ছেলে বাড়ী ফিরে এল।

****

।। গাভী ও কম্বলের ভাগ বন্টন ।।

(এ লোক-কাহিনীটি পশ্চিম দিনাজপুরের ইটাহার, রায়গঞ্জ, করণদীঘি, ইসলামপুর ইত্যাদি অঞ্চলের বাঙাল মুসলমান সমাজে প্রচলিত। দুভাইয়ের মধ্যে বড় ভাই চালাক হলেও শেষে ছোট ভাইয়ের কাছে জব্দ হয়ে গাভী ও কম্বলের সমান অংশ দিতে রাজী হয়েছে।" চেলার নাম বাবাজী" এ প্রবাদ বাক্যকে কেন্দ্র করেই কাহিনীটির উৎপত্তি কিংবা কাহিনী থেকেও প্রবাদ সৃষ্টি সম্ভবপর।)

এক গরীবের দু ছেলে ছিল। সে একটা গাভী ও একটা কম্বল রেখে মারা যায়। এখন দু ভাই মিলে গাভী ও কম্বলটা ভাগ করে নিতে চাই কিন্তু

ভাগবণ্টনেও পুরো সমস্যা । দু ভাইয়ের মধ্যে বড় ভাইই বেশী চালাক । সে গাভীর পিছনের দিকটা নিল আর ছোট ভাইকে দিল সামনের দিক । তাই ছোট ভাই রোজ রোজ গাভীকে খেতে দেয় আর বড় ভাই মজা করে দুধ খায় । আর দু ভাই বসল কম্বলের ভাগ করতে । ঠিক হল দিনের সময় ছোট ভাই ও রাতের সময় বড় ভাই কম্বল ব্যবহার করবে । শীতের দিনে রাতের বেলা ঠান্ডাতে কম্বল গায়ে দিয়ে বড় ভাই সুখে ঘুম পাড়ে অথচ কনকনে শীতে ছোট ভাইয়ের ঘুম হয় না । এইভাবে ছোট ভাই খুব কষ্টে দিন কাটে ।

একদিন ছোট ভাই নিজের দুঃখ কষ্টের কথা চিন্তা করে কাঁদতে লাগল । ঐ সময় রাস্তা দিয়ে এক ফকির হেঁটে চলেছে । সে ছেলের কান্নার শুনে জিজ্ঞেস করল ; "তুমি কাঁদছ কেন বাবা ?" সে বড় ভাইয়ের সমস্ত কীর্তিকলাপ তার কাছে খুলে বলল । শুনে ফকির তাকে বলল ," তুমি এক কাজ কর । আজ থেকে রোজ সন্ধ্যার একটু আগে কম্বলটা জলে ভিজিয়ে তারপর বড় ভাইকে দিও , আর যখন তোমার বড় ভাই গাভীর দুধ দুহিতে বসে তখন তুমি লাঠি দিয়ে মুখে আঘাত করবে ।" পরদিন থেকে ছোট ভাই ফকিরের কথা মত কাজ শুরু করে দিল । বড় ভাই আর কোনমতেই ভিজা কম্বল গায়ে দিতে পারে না । তা ছাড়া সে দিন থেকে তার বড় ভাই দুধ ও খেতে পায় না । নাজেহাল হয়ে শেষপর্যন্ত বড় ভাই দুধ ও কম্বলের সমান ভাগ ছোট ভাইকেও দিতে লাগল ।

****

।। পাকা গনকদার ।।

(এ লোক-কাহিনীটি মালদহের দ্বারবঙ্গীয় মুসলমান সমাজে প্রচলিত । জোলাকে বেশীর ভাগ কাহিনীতে মূর্খ হিসাবে দেখানো হয় । এখানে জোলার মূর্খামি কিংবা চালাকি কিছুই ধরা পড়ে না । সে গনকদার নয় । গোপনে চোখের দেখা জিনিসটা প্রকাশ করাতেই স্ত্রী তাকে গনকদার বলে বিশ্বাস করেছে আর খবরটাও বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়েছে । রাজার মেয়ের হার চুরির গননাতে ভাগ্যক্রমে জোলা নিস্কৃতি পেয়েছে । এর ফলে তার ভাগ্যে স্থিরতা এসেছে ।)

কোন গ্রামে এক জোলা ছিল । সে রোজ সকালে বেলা মাঠে হাল বাইতে যায় অথচ বাড়ীতে এসে তার স্ত্রী তাকে মাত্র আধখানা রুটি খেতে দেয় । জোলার

একদিনও পেট ভরে না । আসলে তার স্ত্রী বেশী খেয়ে স্বামীকে কম খেতে দিত
একদিন সে হাল বলদ নিয়ে মাঠে যাওয়ার নাম করে রান্নাঘরের পিছনে লুকিয়ে থাকল । সে দেখল তার স্ত্রী পরপর সাত খানা রুটি তৈরী করেছে । তারপর সে আগের দিনের মত সময় করে বাড়ীতে গিয়ে হাজির । তার স্ত্রী আবার তাকে আধখানা রুটি খেতে দিল । অমনি সে স্ত্রীকে বলছে," খপ্ খপাতি ,খপ্ খপাতি সাত খান্ আমার খালে কেন আধ খান্?" ভোলার স্ত্রী দেখল কথা তো সত্যি । নিশ্চয় আমার স্বামী গণনার বিদ্যা কোথাও শিক্ষা করেছে । সেদিন ভোলা পেট ভরে রুটি পেল ।

সেদিন ভোলার স্ত্রী আলোচনা প্রসঙ্গে গ্রামের দুচার দশজনকে স্বামীর গণনা বিদ্যার কথা প্রচার করে । পরের দিন ধোপার এক গাধা হারিয়ে গেছে । সে ছুটে এল ভোলা গনকদারের কাছে । ভোলা ঠিক সেই সময় বিষণপুরের মাঠ থেকে পায়খানা ফিরে এসেছে । সে ঐ মাঠে একটা গাধাকে চরতে দেখেছে । সে মাটিতে হাত রেখে ধোপাকে বলল," এক , দুই তিন, তোমার গাধা বিষণপুরের মাঠে ঘাস খাচ্ছে ।" ধোপা মাঠে গিয়ে দেখল ভোলার কথা একেবারে হুবহু সত্যি । তারপর দিন থেকে গণকদার হিসেবে ভোলার নাম বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে গেল । মাস খানেক পর ঐ দেশের রাজকন্যার গলার মনি মুক্তার হার চুরি হয় । রাজা ভোলাকে ডেকে বললেন," আমার মেয়ের হার বের না করতে পারলে কাল সকালে তোমার বাড়ীর সবাইকে শূলে চড়াব ।" ভোলার চোখে আর ঘুম নেই । সে কেবল গোটা রাত শুয়ে শুয়ে ভাবছে" , সকাল হলে তো মরতে হবে ।" কিন্তু ঘুম না হলেও মুস্কিল । সে ঘুমকে বারে বারে ডাকতে লাগল," নিন্দিয়া আয়, নিন্দিয়া আয় ।" ভোলার বাড়ীর পাশেই ছিল নিন্দিয়া নামে এক মেয়ের বাড়ী । সে রাজকন্যার হারটা চুরি করেছিল । ভোলা তারই নাম ধরে ডাকছে শুনে সে মনে করল" গনকদার তো সকালেই রাজার কাছে নামটা প্রকাশ করে ফেলবে ।" সুতরাং নিন্দিয়া বিছানা ছেড়ে ছুটে এসে ভোলার হাতে পায়ে পড়ে গেল । সে কেঁদে কেঁদে বলল;" হার আমি রাজার ছাইয়ের ভিতর লুকিয়ে রেখেছি । দয়া করে আপনি নাম প্রকাশ করবেন না ।" ভোলা তো হাঁফ ছেড়ে বাঁচল । সকালে রাজবাড়ীতে গিয়ে সে হার বেরকরল । রাজা ভাবলেন," এরকম পাকা গণকদারকে কিছুতেই ছেড়ে দেওয়া যায় না ।" তিনি সেদিন থেকে রাজ বাড়ীর গণক পদে তাকে নিয়োগ করলেন ।

****

॥ তৈমুর থেকে তৈমুর লং ॥

(এ লোককাহিনীটিও মালদহের দ্বারবঙ্গীয় মুসলমান সমাজ থেকে সংগৃহীত। তৈমুরকে ঐতিহাসিক ব্যক্তি হিসাবে দেখাবার চেষ্টা এ কাহিনীতে থাকলেও এর সত্যতা সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। তবে গরীব থেকে ধনী হওয়ার পিছনে ভাগ্যকে অস্বীকার করা যায় না। ভাগ্যদেবীর উপর নির্ভরশীল হয়ে মনে হয় গরীবেরা আত্মসন্তুষ্টি লাভ করে থাকে। তার এ সান্ত্বনা লাভের জন্যই বুঝি এ ধরনের লোককাহিনীর সৃষ্টি।)

তৈমুর নামে এক ছেলে কামারের বাড়ীতে হাপর বা ভাতি টানার কাজ করে। সে খুব গরীব। তার বাবা, মা কেউ নেই এমন কি নিজের বাড়ী পর্যন্তও নেই। তাই সে কামারের বাড়ীতেই খায় আর রাতের বেলা ঘুমায়। তার ব্যবহার ও কাজ দেখে কামার খুব খুশী। একদিন দুপুরের সময় তৈমুর হাপর টানছে আর তার মনিব (কামার) লোহা গরম করে হাতুড়ি চালাচ্ছে। হঠাৎ কামারের চোখে ঘুম চলে আসে। বাধ্য হয়ে তৈমুর নিজের কাজ বন্ধ করে বসে থাকে। অল্পক্ষণ পরে সে দেখতে পেল তার মনিবের নাক দিয়ে একটি পিঁপড়ে বের হয়ে আস্তে আস্তে মাটিতে নেমে গেল। সে ভাবল, "দেখায় যাক পিঁপড়েটার কাণ্ড।" পিঁপড়েটা জলের হাউদের কাছে এসে এদিক ওদিক দু'চারবার ঘুরে শেষে খেজুরের ডাণ্ডা দিয়ে পার হল। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে চলতে লাগল। তৈমুর তার পিছন ধরল। আধ মাইল দূরে একটা উঁচু পুরাতন মাটির ঢিবি। তাতেই রয়েছে একটা তালের গাছ। সেই গাছের তলায় এক ছিদ্র। ছিদ্র বেয়ে পিঁপড়ে ঢুকে পড়ল মাটির নীচে। তারপর দশমিনিট বাদে সে বেরিয়ে আবার কামারের বাড়ীর পথ ধরল। আবার সেই হাউদের খেজুরের ডাণ্ডা দিয়ে পার হয়ে পিঁপড়েটা তৈমুরের মনিবের নাকের ভিতর দিয়ে কোথায় যে অদৃশ্য হল কে জানে। তৈমুর নিজের চোখে সব কিছু দেখল। কামার চোখ রগড়ে বলল, "তৈমুর এখন আমি একটি ভাল স্বপ্ন দেখেছি।" "কি স্বপ্ন দেখলেন মালিক" জিজ্ঞাসা করল তৈমুর।

এবার কামার স্বপ্নবৃত্তান্ত চাকরের কাছে প্রকাশ করল। সে বলল, "তৈমুর আজ আমি অনেকদূর চলে গেছিলাম। যেতে যেতে পথে একটা নদী পাওয়া গেল। সেখানে কোন নৌকা নেই। নদীর ধার দিয়ে চলতে চলতে পেলাম একটা সেতু। সেতু পার হয়ে ওপারে অনেকদূর পথ হেঁটে পেলাম একটা

তালের গাছ। গাছের নীচে সুড়ঙ্গ বেয়ে চলে গেলাম একেবারে পাতালে। সেখানে দেখলাম প্রচুর ধন।" তৈমুরের চোখে ভাসতে লাগল সেই তালের গাছ সেই হাউদ আর খেজুরের ডাণ্ডা। কিছুদিন পর সে কামারকে বলল," মহাজন, খাটুনির কিছু পয়সা পেলে একটা জায়গা কিনে নিজের বাড়ী করতাম।" কামার তাকে একটা নিজের বাড়ী স্থায়ীভাবে বাস করার জন্য ছেড়ে দিতে চাইল। কিন্তু সে জবাব দিল, -"না, মহাজন আপনার মরার পর ছেলেরা কোনদিন আপত্তি করতে পারে।" যাই হোক, জমিদারের কাছ থেকে ঐ তালগাছের উঁচু ভিটাটা কিনে দিতে রাজী হল মহাজন। একদিন সকালে দুজন হাজির হল জমিদার বাড়ীতে। জমিদার ভাবল, ভিটাটা তো অনেকদিন থেকে পড়ে রয়েছে কি হবে আর রেখে। মাত্র চার টাকায় তৈমুরকে লিখে দিল জমিটা। অনেক দুঃখ কষ্টে সেখানে একটা ঘর বাঁধল সে। আঙিনার ভিতরে রাখল তাল গাছ। একদিন সন্ধ্যায় গাছের গোড়ার অল্প মাটি খুঁড়তেই দেখল অনেক টাকা। কিন্তু টাকা বের করে খরচ করলে লোকেরা সন্দেহ করতে পারে এই ভেবে তৈমুর প্রথমে রোজ রোজ সন্ধ্যায় পথে ঘাটে কিছু কিছু টাকা ফেলে দিয়ে আসে। সকাল বেলা অনেকে সেটা পেয়ে যায়। সে অন্য কামারের বাড়ীতে কাজ করতে যায়। কামার কথা প্রসঙ্গে তাকে বলল," হাঁরে তৈমুর শুনছি অনেকে পথে ঘাটে টাকা কুড়িয়ে পায়। আমাদের ভাগ্যে কি ফাটা পয়সাও নেই?" ঠিক পরের দিন দু হাজার টাকা আঁচলে ফেলে দিয়ে সকাল বেলা সে কামারের হাতে দিয়ে বলল," মহাজন আমিও আজ এই টাকা কুড়িয়ে পেয়েছি।" কামার বুঝল ছেলেটা ভাগ্যবান। সে ঐ টাকা দিয়ে তৈমুরকে জমি ও হালের বলদ কিনে দিল। জমি আবাদ করতে শুরু করল তৈমুর। তার জমিতে খুব ভাল ফসল। ফসল বিক্রির টাকার সঙ্গে কিছু কিছু তালগাছের গোড়ার টাকা মিশিয়ে ধীরে ধীরে সে জমিদারী ও শেষে বাদশাহী খরিদ করল। তার নাম হল তৈমুর বাদশাহ্।

গরীব থেকে তৈমুর বাদশাহ্ হয়ে তার মনে খানিকটা গর্ব হয়েছিল। সে তোষকের নরম বিছানায় শুয়ে একখানা পা তুলে দেওয়ালে রাখতেই খোদার গজব নাজিল হল। সঙ্গে সঙ্গে তার পাখানা হল খোঁড়া। সেদিন থেকে তৈমুরের নূতন নামকরণ হল তৈমুর লঙ্, বা খোঁড়া বাদশাহ।

****

।। ডাইনী বুড়ী ।।

(এ লোককাহিনীটি মালদহ পশ্চিম দিনাজপুর ও দার্জিলিং জেলার বিভিন্ন মুসলমান ও হিন্দু সমাজে একই রকম কিংবা কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে প্রচলিত।

ডাইনী বুড়ীর ছেলে ধরে খাওয়ার ব্যাপারটা এখনও ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের মনের মধ্যে উঁকি মারে। অন্যদিকে এরূপ ডাইনী বুড়ী সব সমাজেই রয়েছে। যারা ছোট ছোট ছেলে মেয়ের সর্বাঙ্গীন বিকাশকে ব্যহত করে তারা সবাই ডাইনী বুড়ী। এদের জব্দ করার মত সাহসী ছেলের অভাব নেই। এ কাহিনীতে তাই দেখানো হয়েছে।)

কোন এক গ্রামে এক বুড়ী ছিল। তার মাত্র একটা আদরের নাতি। সে নাতিকে বলল, '' আমি পিঠা খাব।'' বুড়ী বাজার থেকে আটা, গুড় এনে পিঠা তৈরী করে নাতিকে খেতে দিল। একটা পিঠা গেল বেঁচে। সেটা তার নাতি আঙিনার মধ্যে পুঁতে দিল। দেখতে দেখতে পিঠার গাছ বড় হয়ে উঠল। রোজ রোজ গাছে উঠে নাতি পিঠা খায়। তার কতই না আনন্দ। একদিন ডাইনী বুড়ী এসে বুড়ীর নাতিকে বলল, '' একটা পিঠা দাও না বাবা।'' গ্রামের বাইরে এক বিরাট জঙ্গলে। সেখানে থাকে এই ডাইনী বুড়ী। ডাইনীরা নানা ধরনের ছল ও কলা কৌশলে গ্রামের ছেলে মেয়েদের ধরে বাসায় নিয়ে মজা করে মাংস খায়। কেউ কেউ ডাইনী বুড়ীকে ছেলে ধরা বুড়ীও বলে। গাছ থেকে পিঠা ভেঙে ছেলেটি বলল, '' হাতে ধর।'' বুড়ী বলল, '' হাত পুড়বে যে তার চেয়ে নীচে নেমে দাও বাবা।'' গাছ থেকে মাটিতে নামল বুড়ীর নাতি। যেই নামা সঙ্গে সঙ্গে ডাইনী বুড়ী তাকে থলির মধ্যে ভরে মুখ বন্ধ করে দিল্ল দে ছুট। পথের ধারে একটা আমের বাগান। সেখানে যেতেই ডাইনীর পিপাসা লাগল। থলিটা রেখে সে গেল পুকুরে জল খেতে। সেই সময় আম বাগানে কতগুলো রাখাল গরু চরাচ্ছিল। তারা দৌড়ে গিয়ে থলিটার মুখ খুলতেই দেখল বুড়ীর নাতিকে। তারা বের করে তাকে বলল, '' তাড়াতাড়ি পালিয়ে যাও।'' ছেলেটি রক্ষা পেল।

এদিকে রাখালেরা থলির ভিতর ইঁট আর কাঁটা ভরে দিয়ে আবার মুখ বন্ধ করে চলে গেল। ডাইনী থলিটা মাথায় নিয়ে হেঁটে চলল। যখন তার মাথায় কাঁটা ফুটছে তখন সে বলল, '' থাকরে ছুড়া তোকে মজা দেখাব''; তুই চিমটি কাটছিস।'' জঙ্গলে অবস্থিত নিজের পাতার ছাওয়া কুটীরে থলি নামিয়ে মুখ খুলে দেখল বুড়ীর নাতি নেই। ডাইনীর একটি মাত্র মেয়ে। সে কুটীরেই থাকে। পরদিন ডাইনী আবার অন্য কৌশলে বুড়ীর নাতিকে ধরে থলির ভিতর বন্ধ করে রাস্তা ধরল। এবার সে পথে কোথাও থামল না। একেবারে সোজা নিজের কুটীরে গিয়ে হাজির। মেয়েকে বলল, '' আজ খুব ভাল শিকার এনেছি। একে ঢেঁকিতে কুটে তৈরী রাখ। আমি ততক্ষণে নদী থেকে স্নান করে আসি। তারপর মা বেটি মিলে মজা

করে খাব।" ডাইনী গেল নদীর ঘাটে স্নান করতে। তার মেয়ে খনির মুখ খুলে ছেলেকে ধরে ঢেঁকির কাছে নিয়ে গেল। বুড়ীর নাতি দেখল তাকে মরতে হবে। তাই কিছুক্ষণ সে ডাইনীর মেয়ের সঙ্গে ধস্তা ধস্তি শুরু করল। শেষ পর্যন্ত বুড়ীর নাতি তাকে জোর করে ঢেঁকিতে কুটে দিল। আর তাড়াতাড়ি ডাইনীর মেয়ের কাপড় চপড় পরে চুপ চাপ বসে রইল। ডাইনী বুড়ী এসে বলল, "বেটি সব তৈরী আছে তো?" বুড়ীর নাতি জবাব দিল, "হ্যাঁ, মা তৈরী করে রেখেছি।" এবার ডাইনী খেতে বসল। পাশে ছিল এক বিড়াল ছানা। সে বলল, "নিজের জন্যা নিজে খায় মেউ!" ডাইনী তাকে লাঠি নিয়ে মারতে উঠলে সে পালিয়ে গেল। ডাইনী যে নিজের মেয়ের মাংস খেয়েছে এটা সে বুঝতেই পারল না। বুড়ীর নাতি ভাবল, "এখান থেকে পালাই কি করে?" সে এক মতলব বের করল। দুপুরের সময় সে ডাইনীকে বলল, "মা আমি নদীতে স্নান করতে যাব।" জলের কলসী আর কাপড় চপড় নিয়ে সে চলে গেল। ঘাটে সব ফেলে দিয়ে সাঁতার কেটে সে নানির বাড়ীতে হাজির হল। হারানো নাতিকে পেয়ে বুড়ীর আনন্দ দেখে কে?

****

।। জমিদার আশুবাবু ।।

(এ লোক কাহিনী মালদহ ও পশ্চিমদিনাজপুরের গ্রামীণ মুসলমান সমাজে প্রচলিত। মালদহের নামকরা জমিদার আশুবাবুর নাম কাহিনীতে স্থান পেলেও এর বাস্তবতা সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ জাগে। ভাগ্য এবং অলৌকিক ঘটনাকে কেন্দ্র করেই এ কাহিনী রচিত। হুবহু এ কাহিনী না হলেও ভাগ্য ও অলৌকিক ঘটনা সম্পর্কিত লোক-কাহিনীর অভাব দেখা যায় না।)

আমাদের দেশে একসময় ছোট বড় অনেক জমিদার ছিলেন। মালদহ জেলার গাজোল থানায় ময়না, গোয়াল টুলি নামে এক জায়গা আছে। সেখানেও একজন প্রতাপশালী জমিদার বাস করতেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিলাসী। আমোদ প্রমোদের মধ্যে দিনগুলো কাটিয়ে যেতেন। তাঁর নিজস্ব একটা নাচমহল ছিল। এখানে রোজ রাতে সুন্দরী যুবতীদের ধরে অর্ধ উলঙ্গ অবস্থায় নাচ করানো হত। আশেপাশের বহু জমিদার এই 'নাচ মহলে' প্রবেশের অধিকার পেতেন। এটাই ছিল অবসর দিনে তাদের আনন্দের খোরাক। এজন্য গোয়াল টুলির জমিদার অন্যান্য জমিদারের কাছ থেকে নির্দিষ্ট হারে টাকা আদায় করতেন। জনসাধারণ এতে জনপ্রমোদের সুযোগ সুবিধা পেত না। গাজোলেও একজন জমিদার ছিলেন। তাঁরই জমিদারীতে চাকুরী

করত আশু । জমিদার আশুকে খুব ভালবাসতেন । তিনি তাকে বসবাসের জন্য খানিকটা জায়গা দিয়েছিলেন । সেখানে একটা কুঁড়ে ঘর তৈরী করে থাকতে লাগল সে । আশুকে সবাই পশ্চিমা বলে ডাকত কারণ সে এসেছিল পশ্চিম দেশ অর্থাৎ বিহারের কোন জায়গা থেকে । গাজোলের জমিদারও ছিলেন নাচমহলের ভক্ত । একদিন আশু বলল" জমিদারবাবু আমিও আপনার সঙ্গে নাচমহল দেখতে যাব ।" খবরদার ! ও কথা আর মুখ দিয়ে বের করিস্ না " এই বলে ধমক দিলেন জমিদার । সে চুপ করে রইল বটে কিন্তু মনে মনে স্থির করল " যে ভাবেই হোক নিশুতি রাতে আমি একাই রাস্তা ধরে হাজির হব সেখানে ।" বিকেল বেলায় জমিদার বেরিয়ে পড়েছিলেন। তার চাকরের মনও মানল না । সেও চুপি চুপি রাত বারটায় ঘর থেকে রওয়ানা হল । মাঠের রাস্তা ধরল সে ।

অন্যদিকে জমিদারদের অত্যাচারে এলাকার সুন্দরী ও রূপবতী যুবতীরা অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিল । কিন্তু ভয়ে কোন কিছু বলার বা প্রতিবাদ করার সাহস তাদের ছিল না । জমিদারদের ঔদ্ধাত্যে তাদের মান ইজ্জত সবই গেল । এসব দেখে জমিদারের ঘরের লক্ষ্মী আর স্থির থাকতে পারল না । জমিদারদের ঘরের টাকার সিন্দুক আপনা থেকেই বের হয়ে চলতে লাগল । আশু মাঠ দিয়ে হেঁটে চলেছে । নিশুতি রাত । সিন্দুক গুলো একেবারে হাজির হল আশুর সামনে । মানুষের ভাষায় বলে উঠল ," তুই কোথায় যাবি আশু , আমরা তো তোর ওখানেই চললাম ।" আশুর আর নাচমহলে যাওয়া হল না । সে ফিরে গেল । আগে আগে চলল সিন্দুকগুলো , তার পিছনে হেঁটে চলল সে । সিন্দুকের বাক্স একেবারে ঢুকল গিয়ে আশুর কুঁড়ে ঘরে । তারপরদিন থেকে জমিদারদের আর্থিক অবস্থা কমে যেতে শুরু করল । নাচের আয়োজন কিন্তু বন্ধ হয় না । জমিদারের হাতে পয়সা নেই । তিনি ভাবলেন" জমিদার হয়ে কারো কাছে টাকা চাওয়া কিংবা হাওলাৎ টাকার কথা বলাও মানসম্মানের প্রশ্ন ।" তাই তিনি তাঁর বিশ্বাসী চাকর আশুকে ডেকে বললেন ," তোকে কিছু টাকা যোগাড় করে দিতে হবে আশু ।" আশু জিজ্ঞেস করল " কত টাকা লাগবে হুজুর ?" তিনি জবাব দিলেন কমপক্ষে পাঁচশ' টাকা ।" সন্ধ্যার সময় আশু জমিদারের দশটা মহিষের গাড়ীতে সিন্দুক-গুলো বোঝাই করে জমিদার বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে বললেন ," এই নিন হুজুর ।" জমিদার সিন্দুক খুলে দেখলেন তাতে সোনার টাকায় ভর্তি । তিনি আশ্চর্য হয়ে গেলেন । সকালে বিছানা থেকে উঠে তিনি আশুকে তিনশ বিঘা জমি লিখে দিলেন । সেদিন থেকে আশুকে সবাই আশুবাবু বলত । জমিদার

মরে যাওয়ার পর আশু বাবু হল জমিদার। তার কোন অহংকার ছিল না। হাঁটুর উপর থেকে ধুতি পরত, গায়ে কোন কিছু থাকত না কেবল মাত্র ঘাড়ে একটা গামছা ঝুলত। কোথাও বের হলে ধুতি পাঞ্জাবী ব্যবহার করত। মরার আগে পর্যন্ত সে নিজের হাতেই গোয়ালঘর পরিষ্কার করত। তার হাতী ঘোড়া আর টাকা পয়সার অভাব ছিল না। কোন অপরিচিত ভদ্রলোক হঠাৎ সেখানে গেলে আশুকে চাকর বলে ভুল করতেন। মালদা শহরে এখনও আশু বাবুর পুরাতন বাড়ী কোন কোন দর্শকের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে চলেছে।

****

।। ধোপা ও কাফনচোর ।।

(এ লোককাহিনীটি মালদহের দ্বারবন্ধীয় মুসলমান সমাজে প্রচলিত। দান করার জন্য ধোপার আয়ু বৃদ্ধি, বাদশাহের মেয়ের কবরের আজাব থেকে মুক্তি লাভ ও কাফন চোরের খোদাভক্ত হওয়ার বিষয় মুসলমানদের ধর্মীয় বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত।)

কোন এক দেশে এক ধোপা ও এক কাফন চোর ছিল। ধোপা রোজ রোজ কাপড়ের মট বহে নিয়ে যায় পুকুরে আবার কাপড় কেঁচে বাড়ী ফিরে আসে। এইভাবে তার দিন কেটে যায়। অন্যদিকে কাফন চোর মুসলমানদের গোরস্থানে গিয়ে রোজ রাত্রে কবরের মাটি খুঁড়ে মরা মানুষের পরনের কাপড় চুরি করে সংসার চালায়। একদিন আল্লাহোতালা আজ্রাইল ফেরেশতাকে হুকুম করলেন, "যাও, কাপড় কেঁচে ধোপা যখন মটটা মাথায় নিবে তখন সাপ হয়ে মাথায় দংশন কর কারণ তার আয়ু শেষ হয়ে গেছে।" সকল জীবের আত্মা বের করার ভার ঐ ফেরেশতার উপর। আজ্রাইল আল্লাহোর হুকুমের তাবেদার। সকালে তিনটা রুটি কাপড়ে বেঁধে ধোপা মট নিয়ে পুকুরে হাজির হল। কাপড় কেঁচে রোদে দিয়েছে এমন সময় এক ফকির এসে বলল, "কিছু খেতে দাও বাবা।" ধোপা কাপড় থেকে তিনখানা রুটি খুলে সবটাই তাকে খেতে দিল। ধোপার আয়ু বৃদ্ধি হোক; এই বলে ফকির খোদার কাছে প্রার্থনা করাতে তা কবুল হল। ধোপা কাপড়ের মট বেঁধে মাথায় উঠিয়েছে আর ফোঁস করে সাপ ফনা তুলে ছোঁ মারার জন্য প্রস্তুত। আল্লাহো তালা ছোঁ মারতে নিষেধ করে দিলেন। ফেরেশতা জিজ্ঞেস করল, "হে খোদা, এ কি করে সম্ভব?" খোদা জবাব দিলেন, "তিনখানা রুটি দানের পুণ্যে ধোপার আরও ত্রিশ বছর আয়ু বৃদ্ধি করা হল।"

কাফন চোর ও নিশুতি রাতে রোজ রোজ কবর খুঁড়ে কাপড় এনে বাজারে বিক্রি করত। সেই দেশের বাদশাহের মেয়ে আল্লাহের নির্দেশিত কোর-আন শরিফ ও হাদিসের নিয়ম নীতি মেনে চলত। সে ভবিষ্যতের অনেক খবর এলহামের মাধ্যমে জানতে পায়। তার মৃত্যু ঘনিয়ে এলে সে বাবাকে বলল, "আগামীকাল বিকাল চারটার সময় আমার মরণ। এই দেশে এক কাফন চোর আছে সে কবরে ঢুকে আমারও পরনের কাপড় চুরি করবে।" বাদশা মেয়েকে জিজ্ঞেস করলেন, "তার xxx হাত থেকে রেহাই পাওয়ার উপায় কী?" মেয়ে বলল, "হয়তো অভাবে পড়ে লোকটি এই ধরনের নিকৃষ্ট কাজ করছে। আপনি বরং তাকে অর্ধেক বাদশাহী ও কিছু টাকা দান করুন।" বাদশাহ মেয়ের কথামত কাফন চোরকে ডেকে আনলেন। তিনি তাকে অর্ধেক বাদশাহী ও নগদ দশহাজার স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করে কাফন চুরির কাজ ছেড়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি আদায় করলেন।

নির্দিষ্ট সময়ে বাদশাহের মেয়ে মারা যায়। তাকে আতর গোলাপের পানীতে গোসল দেওয়া হয় তারপর মূল্যবান কাফন পরিয়ে দাফন করা হয়। কাফন চোর বাড়ীতে ফিরে এসে ভাবছে তার আর অভাব কিসের? কিন্তু বাদশাহের মেয়ের মূল্যবান কাফনের লোভ সে সামলাতে পারল না। সে রাতের অন্ধকারে চুপি চুপি গোরস্থানে পৌঁছাল। দাফন করার পর লোকগুলো নিজ নিজ বাড়ীর পথে চল্লিশ কদম হেঁটে গেলে কবরে মুনকির ও নকির ফেরেশতা দুজন এসে বাদশা-হের মেয়েকে নানা ধরনের প্রশ্ন করল। তার অন্য কোন অপরাধ ছিল না কেবলমাত্র সে একটি পাপ করেছিল। একদিন সে অন্যের একটি খড় নিয়ে দাঁতের ময়লা পরিষ্কার করেছিল। খড়ওয়ালাকে না বলাটাই তার অপরাধ। তাই আল্লাহতা আলা খড়কে আদেশ করলেন, "তুমি সাপ হয়ে বাদশাহের মেয়ের দাঁতে ঝুলে থাক।" কাফন চোর কবরের মাটি খুঁড়ে সাপকে দেখে ভয়ে ভিতরে ঢুকার সাহস পেল না। বাদশাহের মেয়ে তাকে বলল, "তুমি এত কিছু পেয়েও কি সন্তুষ্ট হতে পারলে না?" যাই হোক, তুমি যখন এখানে এসেই পড়েছ তখন আমার একটা কথা শুনে যাও। আমার বাবাকে বলে দিও, "তোমার মেয়ে খুব কষ্টে রয়েছে। খড়ওয়ালা করিম সেখ যদি ক্ষমা করে তা হলে আমি রেহাই পাই।" কাফন চোর বাদশাহকে তার মেয়ের কবরের আজাব সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভাবে প্রকাশ করলে বাদশাহ ছুটে গেলেন করিম সেখের বাড়ী। করিম তার মেয়ের অপরাধ ক্ষমা করলে কবরের আজাব থেকে সে মুক্তি পায়। সেদিন থেকে কাফনচোরও সবরকম পাপ কাজ ছেড়ে খোদার পরম ভক্ত হয়ে ওঠে।

****

।। কাক ও ফুতকি রানী ।।

(এ লোক-কাহিনীটি মালদহ জেলার মানিকচক, রতুয়া ও ইংলিশ বাজার এলাকাধীন দ্বারবঙ্গীয় মুসলিম সমাজে প্রচলিত। কাক যতই ধূর্ত ও চালাক হোক না কেন এ কাহিনীতে তাকে অত্যন্ত নির্বোধ ও বোকা হিসাবে প্রতিপন্ন করা হয়েছে। একটা ছোট পাখী ফুতকি রানীর কাছে কাককে শুধু পরাজয় বরন নয় নিজের জীবন পর্য্যন্ত দিতে হল।)

কাক ও ফুতকি দু পাখী নিজের বাসায় ডিম পেড়েছে। উভয়ে ঠিক করল ফুতকির বাচ্চা হলে কাক খাবে আর কাকের বাচ্চা হলে ফুতকি খাবে। আগে কাকের ডিম থেকে বাচ্চা হল। ফুতকি রানী তার বাচ্চাকে খেয়ে ফেলল। কয়েকদিন পর ফুতকি রানীর বাচ্চা হলে কাক গিয়ে হাজির। ফুতকিরানী তাকে বলল, "তুমি তো ময়লা খাও তোমার ঠোঁটে ময়লা লেগে রয়েছে। আগে ইন্দারা থেকে মুখ ধুয়ে এস, তারপর বাচ্চা খেতে পাবে।" কাক ইন্দারার কাছে গিয়ে বলল, "ইন্দারা ভাই, ইন্দারা ভাই পানী নিব, ঠোঁট ধুবো, খাব ফুতকি রানীর বাচ্চা।" ইন্দারা বলল, "কুজো না হলে পানী ভরবে কিসে? চলে যাও কুমোরের বাড়ী।" কুমোরের কাছে গিয়ে আবার সে ঐ কথা বলল। কুমোর তাকে পাঠাল মাটি আনতে। তার কাছে মাটি ছিলনা, কারন মাটি ছাড়া তো কুজো তৈরী করা যায় না। কাক গেল মাটি আনতে। সে বলল, "মাটি ভাই মাটি ভাই, মাটি নিব, কুজো গড়ব, পানী ভরব ঠোঁট ধুবো, খাব ফুতকি রানীর বাচ্চা। মাটি বলল, "আমার কোন আপত্তি নেই কিন্তু খুঁড়বে কিসে? যাও হরিনের শিং নিয়ে এস।" হরিণের কাছে গিয়ে সে শিং চাইল। হরিণ তাকে বলল, "আমি তো নিজের শিং নিজে ভাঙতে পারি না, তুমি কুকুরকে লড়াই করার জন্য ডেকে আন। সে লড়াই করে আমার শিং ভাঙবে।"

কাক উড়তে উড়তে কুকুরের সামনে হাজির হয়ে তাকে হরিণের সঙ্গে লড়াই করতে অনুরোধ করল। কুকুর বলল, "আমি খুব দুর্বল হয়ে পড়েছি, লড়াই করার শক্তি আমার নেই। তুমি যদি গাভীর দুধ এনে আমাকে খাওয়াতে পার তবেই লড়তে পারি।" সে তখন গাভীকে গিয়ে বলল, "আমি দুধের জন্য এসেছি। দুধ নিব, জোর হবে লড়বে কুকুর, ভাঙবে শিং খুঁড়ব মাটি, গড়ব কুজো, ভরব পানি, ঠোঁট ধুবো খাব ফুতকি রানীর বাচ্চা।" গাভী কয়েকদিন থেকে ঘাস খায় নি বলে তার দুধ শুকিয়ে গেছে। সে বলল, "তুমি যদি আমাকে ঘাস খাওয়াতে পার তবেই দুধ দিতে পারি।" কাক গেল মাঠে ঘাস আনতে। সে দেখল

সারা মাঠে ঘাসে পরিপূর্ণ কিন্তু কাটবে কিসে ? ঘাস কাককে পাঠাল কামারের বাড়ী থেকে কাস্তে আনতে। সে উড়তে উড়তে কামারের বাড়ীতে উঠল। তাকে বলল, "কামার ভাই, কামার ভাই নিব কাস্তে, কাটব ঘাস, খাবে গাভী হবে দুধ, নড়বে কুকুর ভাঙবে শিং খুড়ব মাটি গড়ব কুজো ভরব পানি, ধুবো ঠোঁট তারপরে খাব ফুতকি রানীর বাচ্চা।" কামার কাককে জিজ্ঞেস করল, "লাল নিবে না কালো ?" সে ভাবল লাল রংটাই ভাল হবে। সে লাল কাস্তে চেয়ে বসল। কামার আগুনে গরম করা টকটকে লাল রঙের কাস্তে দিয়ে তাকে বলল, "নিয়ে যাও।" কাক যেমনি কাস্তেটা ঠোঁটে ধরেছে অমনি পুড়ে সে সঙ্গে সঙ্গে মারা পড়ল। কাকের হাত থেকে ফুতকি রানীর বাচ্চারা রক্ষা পেল।

{**

(এ ধরনের লোক কাহিনী মালদহ ও পশ্চিম দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত। এখানে দার্জিলিং জেলার ফাঁসীদহ এলাকার রাজবংশী মুসলমান সমাজভূক্ত শৈলানী জোৎ গ্রামের মো: তসিরুদ্দিনের (পিতা মো: আব্দুল গফুর) নিকট থেকে যৎকিঞ্চিৎ স্থানীয় ভাষায় এ কাহিনী গুলো সংগৃহীত। সমগ্র ফাঁসী-দহ, শিলিগুড়ি, নকসালবাড়ী ও খড়িবাড়ী এলাকায় এগুলো কাহিনী অশিক্ষিত ছোট ছোট গ্রাম্য ছেলে মেয়েদের আনন্দের খোরাক হিসেবে আজও বর্তমান।)

।। বুড়া-বুড়ী ও শিয়াল ।।

এক ছিল বুড়া আর একটা ছিল বুড়ী, । বুড়ি পিন্দে চুরি। বেটি পিন্দে মাকড়ি। একদিন কুড়ি-পঁচিশটা শিয়াল এল। বুড়া গাড়ে কচু। বুড়াকে শিয়ালগুলো বলল, "সিদ্ধ করে গাড়তে হবে। তিন দিন পরে গেজে যাবে।" বুড়া তাই করল। শিয়ালগুলো রাতের বেলা মজা করে সব কচু খেয়ে ফেলল। বুড়া-বুড়ী মনে মনে শিয়ালগুলোকে খুব গাল দেয়। একদিন বুড়া-বুড়ী দুজনে বেটির বাড়ী যাবে। শিয়াল বলল, "আয় বেটা তোদের খেয়ে ফেলি।" বুড়ী তখন একটা টোকার মধ্যে ঢুকে গড় গড়াতে গড় গড়াতে বেটির বাড়ী চলে গেল। বুড়াও ঠিক সেই মতো কাজ করল। অর্ধেক রাস্তা গিয়ে বুড়া যেই বেরিয়ে পড়ল অমনি যায় আর কোথায়, সামনে শিয়াল হাজির। শিয়ালটা বুড়াকে খেয়ে ফেলল। বেটির বাড়ী থেকে ফিরে বাড়ী আসার পথে শিয়াল বুড়ীকেও খেয়ে ফেলল।

XXXXXXXXXXXX

~~শব্দার্থ ও টীকা~~ :-

শব্দার্থ ও টীকা : -

বুঢ়া - বৃদ্ধ । বুঢ়ী - বৃদ্ধা । পিন্দে - পরে, পরিধান করে । ঝাকড়ি - অলংকার বিশেষ । গাড়ে -পুঁতে, রোপন করে । গেজে-অঙ্কুর বের হওয়া । টোকা - লাউ । গড়-গড়াতে - গড়িয়ে ।।

****

।। জমিদার ও শিয়াল ।।

এক জমিদারের কুশিয়ারের ক্ষেত ছিল । শিয়াল রোজ কুশিয়ার খেয়ে ফেলে । জমিদারের ভীষন রাগ হল । সে একটা ডান্ডা নিয়ে কুশিয়ার বাড়ীতে ঘুমিয়ে ছিল । সত্যিকার সে ঘুমায় নি ঘুমের ভান করে শিয়ালটাকে জব্দ করার ফিকিরে ছিল । শিয়াল বুঝল, জমিদার ঘুমায় নি । তার কাছে এসে শিয়াল যেই বলল, "গাছে আছে তোর দাদাঠাঁর বাপ্ !" অমনি জমিদার খিল খিল করে হেসে ফেলল । তখন শিয়াল পালিয়ে গেল । জমিদার কিছুতেই শিয়ালকে জব্দ করতে পারল না ।

শব্দার্থ ও টীকা :-

কুশিয়ার - আখ । ডান্ডা - বাঁশের বড় লাঠি । দাদাঠাঁর বাপ - বাবা থেকেও বড় । এখানে বীর অর্থে ব্যবহৃত ।

****

।। পিঠা ও বুঢ়ীর ছেলে ।।

একটা যে বুঢ়ী আর একটা যে চেংড়া । চেংড়াটা কহছে কি, "মাগো মা মোক পিঠা খাবা মন আছে ।" ওর মা বলছে, "বেটা ধান তো নাই, পিঠা কি করে খাবু ? একটা রাজার বেটা ঘোড়া চড়ায় ধান খায়ে ধান হাগিছে ।" চেংড়াটার মা ছান কুড়বা গেছে । ওটা এনে ধান বের করে গুড়বা দিছে । তারপর কুটিছে । চাউলটাক্ ভিজাই আলুয়া ঢাকিত দিছে । পানীলো ঝরে গেলে কুটে পিঠা বেনায় খাছে । ছেলে বলল, "মা, মা একটা পিঠা গেড়ে দিব । মা বলছে, "পিঠা গাড়লে হবে না !" ওর বেটা যাছে পরু চর্বা । সুট করে একটা পিঠা কোছাত্ ঢুকাই নিছে । সে নিয়ে গিয়ে আলির মধ্যে গেড়ে দিল্ । বেলা ডুবলে পরু নিয়ে বাড়ী গেল্ । সকালে উঠে সে পিঠার গাছ দেখতে গেছে । এক ঢাকি পিঠা তুড়ে বাড়ী ত্ নিয়ে গেল, । মায় চাহা বানাল । ওর মাক্ ডাক দিল । মা উঠে বলল, "বেটা পিঠা কেদুর মপাল ?" চেংড়াটা কহিল, "মুই পিঠার গাছ গাড়ি ছিনু বড় হইছে, ফলিছে । ওইটা তুড়ে আনছু ।" তারপর মা-বেটা পিঠা খাবা ধরছে । আবার চেংড়াটা পরু

চরবা গেল। সে চড়িছে পিঠার গাছত্। পিঠা খাবা ধইছে। এক বুড়ী আসে বলছে, "মোক একটা পিঠা দে।" একটা পিঠা দেল্ কিন্তু মেশার মুতানাতে পড়ে গেল্। বুড়ী বলল, "বাবু আর একটা দে।" সেটা গুখানাতে পড়ে গেল্। গাছটাতে আর মাত্র আর একটা পিঠা আছে। বুড়ী বলল, "বাবু হাতে হাতে দে।" যেই হাতে দেওয়া অমনি বোরাত্ ঢুকাই নিয়ে বাড়ী চলে গেল্। বেটার বৌকে বলল, "এক চেংড়া আনুছি। চেংড়াটার দাঁত লাল হইছে।" বৌ ছেলেটাকে বলল, "তোর দাঁতলা মোক দে।" ছেলেটি বুদ্ধি খাটিয়ে বলল, এক চামচ তেল গরম করে আন্, তার পর সে গরম তেলখান মুখে ঢেলে দিল্। সঙ্গে সঙ্গে বৌটা মরে গেল্। কাপড় চোপড় খুলে ছেলেটা পিনছে। সে বৌটাকে জবাই করে রান্না করল। একটা কেনি আঙুল খুসে রাখিছে। বুড়ীটা ওর বহুর মাক আনবা গেছে। ওখান থেকে ফিরে এসে বলছে, "বহু রানছিস?" সে জবাব দিল "রানছু।" বুড়ীটা বহুর মাক বলছে, "বস্ ভাত খাও।" চেংড়াটা আলাদা একটা মুরগা জবাহ কন্নিল। মিহি ধানের ভাত রান্ধিল্। রান্ধে খাবে। খায়দায় সবাই মিলে নন্দী গেছে গোজল ধুবা। চেংড়াটা হেসে নদীর ওপার গেল্। মায় বলছে, "তোর বহুক তোকে খিলান্ চেঁটুডি খাইস্।" সে নিজের ঘরত্ চলে গেল্। এদিকে বুড়ী আর সমধিন কানতে কানতে ঘর চলে গেল।

শব্দার্থ ও টীকা :-

ছে - আছে। কহছে কি - বলছে। মাগে - মা। মোক - আমাকে, আমার। খাবা - খাওয়ার। ওর - তার। কি করেখাবু? - কেমন করে বা কি ভাবে খাবে? বেটা - ছেলে। ঘোড়া চড়ায় - ঘোড়াতে চড়ে। ধান খায়ে ধান হাগিছে - ধান খেয়ে ধান পায়খানা করে। চেংড়াটা - ছেলেটা। ছান - গোবর। কুড়াবা - কুড়াতে। শুকবা - শুকাতে। ভিজাই - ভিজিয়ে। আলুয়া ঢাকি - বাঁশের ঝুড়ি বিশেষ। পানীলা - সব জল। বেনায়া - তৈরী করে। চরবা - চরাতে। কোছাত্ - কোমরে। ঢুকাই - লুকিয়ে। আলি - জমির আল বা সীমানা। ঢাকি - ঝুড়ি। তুড়ে - তেড়ে। মায় চাহা বানাল - দিয়ে চা তৈরী করল। মাক - মাকে। কদ্দুর গাল্? - কোথায় গেলে? মুই - আমি আনছু - এনেছি। গাছত্ গাছে। আসে - এসে। দে - দাও। দেল - দিল। মুতুখানাতে - প্রস্রাব করার জায়গায়। গু খানাতে - পায়খানার জায়গায়। বোরাত - থলি বস্তা। দাঁতলা - দাঁত গুলো। কেনি আঙুল - কনিষ্ঠ আঙুল। চালটাত্ - ঘরের চালে। বহু - বৌ। রানুছু - রান্না করেছি। কন্নিল - করল। রান্ধিল্ - রান্না করল। খাবে - খেল। নন্দী - নদী। গোজল ধুবা - স্নান করতে। চেঁটুডি খাইস্ - কাটি কলা খাও।

****

।। বক ও রাখাল ।।

একটা ছিল বুড়ী ।ওর ছিল একটা বেটা । সে রাজার বাড়ীর গরু চরায়, আর গুড়াল নিয়ে যায় । রোজ পাখীগুলোকে মারে ।একদিন একটা বক এসে পড়ল মাঠে । বকটা বলল,"তোকে একটা বৌ দিব মোক মারিস্ না ।" মোর ডেনায় তুড়ি বান্ধে দে । দুটা ফুটা করে দিল । বোগলাটা উড়তে উড়তে চলে গেলু ।তিনদিন পর তুড়িলা গাজে গেল । চেংড়াটা তখন তুড়ির গাছ দেখতে দেখতে বোগলার বাড়ী চলে গেলু । ডাকিলু,"বোগলা ভাই, বোগলা ভাই ।" বোগলা নিকলে আসিলু ।তখন একটা ডিম দিলে চেংড়াটাক্ । বোগলটা চেংড়াটাক কহলে, "আধা রাস্তাতে ডিমটা ফাটাইসনা ।" চেংড়াটা রাস্তাত্ চলে গেল । সে মনে মনে কহল কি; "ডিমটা ভাঙ্গি দেখুদি ।" ডিমটা ভাঙতেই একটা বৌ নিকলে গেলু । তারপর বৌটা বলল, গাড়ী লাগে আর বাইজ লাগে । চেংড়াটা চলে গেলু আনবা । তখন একটা ঘুসি কুড়ি ঘুসি কুড়াছে । মাগটা তাকে বলছে, "পানী খাবার কুয়া হে ;" সে জবাব দিল, "হে", তারপর ঘুসি কুড়িটা ওক্ দেখায় দিলে । বৌটা পানী খাবা গেল । পিছন দিক থেকে ঘুসি কুড়িটা ধাক্কা দিয়ে ফেলায় দিলে চুহাটাত্ । তারপর ঘুসিকুড়িটা মেয়েটার কাপড় পরে গাছটাত্ চড়ি বসিলু ।চেংড়াটা বাইজ আর গাড়ী নিয়ে আসি ঘুসি কুড়িটাক ওঠাই নিয়ে চলি গেলু । কিছুদিন পর চেংড়াটা সিয়ান-করবা আসিলু ।ঐ চুহাটাত্ এক কুমের গাছ হইছে । যেগলা চেংড়া ছিল তারা কহল কি; "গাছটা কায় উঠবা পারে ?" শেষে ঐ চেংড়াটা উঠাইলু । গাছটা নিয়ে ওর গলিটাত্ গাড়ি দিলে । ঘুসি কুড়িটা খাচ্ছে, বেড়াছে । তখন গলিটাত্ কদুর গাছ হইলু । ও মাহ্ ভাত খায় দায় থালি উইবে রাখি দিলে । কদু থেকে বৌটা নিকলে থালি ধুড়িলা মাঞ্জে দিলে আর ঘরটা মুছে দিলে ।তারপর চেংড়াটা মনে মনে কহিলু ;"কায়লা এনুংলা কাম করছে ?" সে একদিন পাহারা দিলে । বৌটা কদু থেকে নিকলে ভাত খায় দায় থালি ধুড়ি রাখি দিছে । চেংড়াটা তাকে ধরে ফেলল । সে কহছে, "তুই কায় ?" চেংড়িটা কহিল, "মুই তোর মায়া ।" সে আগেকার সব ঘটনা খুলে বলিলু । চেংড়াটা মারি ডাঙ্গায় ঘুসি কুড়িটাকে নিকলায় দিলে । আর চেংড়িটাক্ নিয়ে সে দিন সংসার চালাচ্ছে ।

শব্দার্থ ও টীকা :-

গুড়াল -বাটুল । মোক - আমাকে । মোর - আমার । ডেনায় -ডানায়, পাখায় । তুড়ি -সরিষা । বান্ধে দে - বেঁধে দাও । বোগলা-বক । ডাকিলু - ডাকল । নিকলে আসিলু -বের হয়ে এল । ফাটাইসনা - ফাটিয়ে দিও না, ভেঙে দিও না । ভাঙ্গি দেখুদি -ভেঙে দেখি তো । বাইজ-বাজনা ।আনবা - আনতে । ঘুসি কুড়ি - যে ঘুঁটে কুড়ায় ।

মায়াটা - মাগীটা, স্ত্রী, বৌ। কুয়া - ইদারা, কূপ। ওক্ - তাকে।
দেখায় দিলে - দেখিয়ে দিল। চুয়াটাত্ - ইদারাতে, কূপের ভিতর। ওঠাই
লিয়ে - উঠিয়ে নিয়ে। সিয়ান করবা আসিলু - স্নান করতে এল। কুমের-ফুলের।
ভেল্লা চেংড়া - অনেক ছেলে। কায় উঠবা পারে? - কে তুলতে পারে? গলিটাত্ -
বাড়ীর পিছন দিকের জায়গায়। কদু - লাউ। ওয়াহ্ - সে। উইকে - উল্টিয়ে।
থালি থুড়িলা - থালা বাটিগুলো। কায়লা এগুলা কাম করছে - কে এগুলো কাজ
করছে। তুই কায়? - তুমি কে? মুঁই তোর মায়া - আমি তোমার বৌ, স্ত্রী।
মারি ডাঙ্গায় নিকলায় দিলে - মেরে পিটে তাড়িয়ে দিল।

****